প্রেরণা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র



দাম এগারো সিকা

*

এ বই ছেপেছেন
গিরীন্দ্রনাথ সিংহ
দি প্রিন্টিং হাউস
৭০, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা—৯

*

প্রকাশ করেছেন
প্রফুল্লকুমার বসু
পি. কে. বোস এণ্ড কোং
ঢাকুরিয়া

*

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
রঘুনাথ গোস্বামী
পাইকপাড়া

*

ব্লক ও মলাট
অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটো টাইপ ষ্টুডিও
৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*

বই বেঁধেছেন
মাজেম আলি খান্
৭, পাটোয়ার বাগান লেন
কলিকাতা

কবি, রসিক ও শব্দকৌশলী

কৃষ্ণদয়াল বসু

করকমলে

এই লেখকের—

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
ভাড়াটে বাড়ী
বহু বিচিত্র
রজনীগন্ধা
স্বর্ণমুকুর
পুরুষ ও রমণী
মনে ছিল আশা
প্রভাতসূর্য্য
কোলাহল
নববধূ
স্মরণীয় দিন
নবযৌবন
চতুর্দ্দোলা
রাত্রির তপস্যা
দুর্ঘটনা
পৃথিবীর ইতিহাস

প্রেরণা

খেয়া একটা পারাপার করে বটে, কিন্তু শুধু খেয়াঘাট সেটা নয়। ভেতরের দিকে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে নৌকো ছাড়া যাওয়া যায় না। সেই সব গ্রামের যাত্রীদের জন্যই সকালে ও বিকেলে একটা করে বাস্ ছাড়ে, একেবারে মহকুমা শহর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। ঐ একটিই বাস্—দুবার যাতায়াত করে। কোনদিন কল বিগড়ে গেলে স্থানীয় লোকদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। একটা ভাঙা ঝরঝরে গাড়ি আছে, ট্যাক্সি নামটা তার পক্ষে অতিশয়োক্তি, সেইটেই সে-সব দিনে একমাত্র ভরসা। ঐ যাত্রী-বাসের মালিকরাই তখন সেটা চালান এবং তদাকার একখানা মোটরগাড়িতে বারো জন পর্যন্ত অনায়াসে তোলেন!

বাস্ খারাপ না হলে কিন্তু সে গাড়িও আসে না। নিতান্ত 'মেল' কন্ট্রাক্ট আছে বলেই সেটা তখন বার করতে হয়, নইলে এ রাস্তায় ট্যাক্সি আনলে নাকি গাড়ির আর কিছু থাকে না। সুতরাং—উর্মিলা যখন নৌকো থেকে সেদিন এসে নামল তখন শেষ বাস্ ছেড়ে গেছে এবং শহরে পৌঁছবার আর কোন যান-বাহনই পাওয়া তখন সম্ভব নয়। অবশ্য বাস্‌ওয়ালাদের দোষ দেওয়া যায় না, কেন না তাদের গিয়ে ট্রেন ধরাতে হবে, তবু ত ছাড়বার সময়ের পুরো উনিশটি মিনিট পরেই ছেড়েছে তারা।

উর্মিলা একবার অসহায় ভাবে চারিদিকে তাকাল। বুড়ো মাঝির জন্যই এই কাণ্ডটি হল—কিছুতেই সে জোরে বাইতে পারলে না, বখশিষ দেবার বহু রকম প্রলোভন দেখানো সত্বেও না। সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নেই, আকাশের দিকে চেয়ে উর্মিলা বহুক্ষণই বুঝতে পেরেছে যে

তার অদৃষ্টে আজ বহু দুঃখ আছে। ওর হাতঘড়ি ছিল না সঙ্গে, কিন্তু সাড়ে পাঁচটার বাস্ যে আর থাকা সম্ভব নয়, তা বেলার দিকে চাইলেই বোঝা যায়, ঘড়ি দেখতে হয় না।… তবু একটা ক্ষীণ আশা হয়ত কোথায় ছিল, সেটুকুও নদীর পাড় ভেঙে ওপরে উঠতেই একেবারে চলে গেল। বাস্ ত নেই-ই, ঘাটে একটা লোক পর্যন্ত নেই। যাত্রী কম বলে সব সময়ে এখানে দোকানপাট থাকে না, সকালে বাসের সময় থেকে বিকালের এই সময়টা পর্যন্ত, তারপরই সব ঝাঁপ ফেলে বাড়ি ফিরে যায়। আর দোকানও ত ভারি! গোটা-দুই চা, পানবিড়ি, খাবারের দোকান, তারই সঙ্গে দরকার মত দু'একটা মনোহারী জিনিসও থাকে। আর একটা আছে শুধুই বিড়ির দোকান। এছাড়া দুপুরবেলা গাছ-তলায় একটা নাপিত, একটা মুচিও বসে। কিন্তু সেও ঐ বাসের সময় পর্যন্ত, তারপর কারুর টিকি দেখা যায় না।

অবস্থাটা শুধু বিরক্তিকর নয়, বিপজ্জনকও বটে। দক্ষিণ বঙ্গের নিবিড় জঙ্গল চারিদিকে, তারই মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসে স্থানটাকে রীতিমত ভয়াবহ করে তুলেছে। বাঘ ত এখন এধারের জঙ্গলে থাকেই, সুন্দরবনের এত কাছে যখন, তখন রয়াল বেঙ্গলও থাকা বিচিত্র নয়। তা ছাড়া, রাজনীতি করতে এসে না হয় পুলিশের ভয় ত্যাগ করতে হয়েছে, তাই বলে চোর-ডাকাত-ঠ্যাঙাড়ের ভয় থাকবে না এমন কোন কথা নেই। ভয়ে উর্মিলার গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। পূর্ণেন্দুর কথা শুনে আজকের রাতটা ওদের ওখানে থাকলেই হ'ত, কাল সকালেই সে আসবে, উর্মিলাকেও সেই সঙ্গে আসবার কথা বলছিল; কিন্তু কী যে ওর দুর্মতি হল—কাল সন্ধ্যায় কলকাতায় মিটিং আছে এই অজুহাত দেখিয়ে ও কিছুতেই থাকতে রাজি হল না। অবশ্য মিটিং আছে ঠিকই, খুব জরুরী মিটিং তাতেও সন্দেহ নেই, কিন্তু সে এমন

কেউ নয় যে সে না গেলে সভা বন্ধ থাকত, কিংবা কোন বিশেষ প্রস্তাব 'পাশ' হ'ত না! তার এমন কিছু বলবারও নেই, বক্তৃতা দিতে ভালও লাগে না। ওটা শুধুই বাহাদুরী। পূর্ণেন্দুর কণ্ঠে 'স্ত্রীলোক' বলে যে একটা আশঙ্কার সম্ভাবনা উঁকি মেরেছিল—সেইটের জবাব দিতেই কতকটা সে জোর করে বেরিয়ে পড়ল। দেশের কাজে যখন নেমেছে, তখন আবার পুরুষকে ছাড়া একা ভ্রমণ করতে পারবে না—এমন কোন দুর্বলতা উর্মিলার নেই। পূর্ণেন্দু দেখুক যে উর্মিলা ঠিক সাধারণ মেয়েছেলে নয়—সে একাই স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে।

তবে এ সম্ভাবনাটা তখন মনে হয়নি একবারও। আর সময়ও ছিল ঢের, সব মাটি করলে ঐ বুড়ো মাঝিটাই। এ-ও পূর্ণেন্দুর একটা চালাকি। বিশ্বাসী লোক বলে বেছে বেছে ঐ বুড়ো মাঝির নৌকোই সে ডেকে আনলে। যেন অন্য মাঝিরা ওকে খেয়ে ফেল্‌ত মাঝপথে বা খুন করত!—এখন ও কি করে!

নিচের দিকে চেয়ে দেখলে যে, দিনের বাকি আভাসটুকুকে কাজে লাগাবার জন্য ইতিমধ্যেই বুড়ো নৌকো ফিরিয়েছে বাড়ির দিকে। ভাঁটার টানে সেটা চলেও গেছে অনেকটা, ওর ক্ষীণকণ্ঠের আহ্বান এখন আর তার কাছে পৌছবে না। খেয়ানৌকোটা ওপারে রেখে মাঝি বাড়ি গেছে। বাস্ ছেড়ে গেলে আর যাত্রী থাকে না, খেয়া-চলাচল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। কাছাকাছি গ্রাম নেই, অন্তত ওর চোখে পড়ল না। কতদূরে আছে কে জানে। প্রশ্নই বা করবে কাকে। আর কিছু না হোক্, একটা আশ্রয় ত চাই রাত্রে!—এতবার মহামান্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পুলিশবাহিনীর হাত এড়িয়ে এসে শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটে সে যেতে পারবে না কিছুতেই।

কিন্তু সত্যিই কি কেউ নেই?

অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে ওর নজর পড়ল বিড়ির দোকানের পেছন দিকে একটি ছোক্‌রা দাঁড়িয়ে দোরে তালা লাগাচ্ছে। সে এতক্ষণ ভেতর থেকে দোকান বন্ধ করছিল বলেই চোখে পড়েনি। যাক—তবু মানুষের মুখ দেখা গেল। উর্মিলার মুখ আশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকলে, 'শোনো, এখানে কি গাড়ি-টাড়ি কিছু পাওয়া যায় না? নিদেন গোরুর গাড়ি?'

ছেলেটি এতক্ষণ ভেতরে ছিল বলে ওর অস্তিত্ব বোধ হয় টেরই পায়নি, হঠাৎ গলার আওয়াজে চম্‌কে উঠল, 'কে গা? কী বলছ?'

উর্মিলা ওর দিকে চেয়ে একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল, হয়ত বা অকারণেই। মানুষটিকে যেমন মনে করেছিল ও তেমন নয়—তার চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ। বড়জোর উনিশ কুড়ি বছর বয়স, বেশ জোয়ান চেহারা, গায়ের রং মিশ্‌ কালো। চোখ দুটিতে আদিম সরলতা ও কৌতূহল মাখানো, উর্মিলাকে দেখে যেন বিস্ময়ের অন্ত নেই ওর। উর্মিলা ওর দিকে চেয়ে একটু যেন থতিয়ে গিয়ে বললে, 'বলছিলুম, এখানে কোন গাড়ি পাওয়া যায় না?'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে একটু কৌতুক খেলে গেল। প্রশ্ন করল, 'তোমার দেশ কোথা? কোত্থেকে আসছ?'

সেই আদিম প্রশ্ন। এখানকার কোন পল্লীগ্রামেই এ প্রশ্নটির উত্তর না দিয়ে নিজের কোন প্রশ্নের জবাব পাবার উপায় নেই। বিরক্ত কণ্ঠে উর্মিলা বললে, 'বাড়ি আমার কলকাতা। গাড়ি পাওয়া যাবে কি? শহরে যাব—'

'গাড়ি?—হুঁ!' ছেলেটা হেসে উঠল, 'এখানে গাড়ি কোথা!'

'গোরুর গাড়িও পাওয়া যায় না?'

'যায়, দিনের বেলা। রাতের বেলা বাঘের মুখে পড়বে কে বলো!'

ঊর্মিলার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা শিহরণ বয়ে গেল। সে উদ্বিগ্ন মুখে বললে, 'কোনরকম গাড়ির ব্যবস্থা কি করা যায় না? আচ্ছা, ঐ নৌকোটা ত আমাকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারে? যাবো রতনপুর।'

'ও ত খেয়ানৌকো। মাঝি সারাদিন খেটেছে, এখন দূর পাল্লায় যেতে চাইবে না। তাছাড়া পারানি-নৌকো ঘাট থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার আইন নেই।'

'তবে?' ঊর্মিলার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'তবে আমি এখন যাবো কোথায়?'

এবার ছেলেটির চোখে অনুকম্পা ফুটে উঠল। সে একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'গ্রামে যাবে?'

'গ্রাম কত দূর?'

'তা প্রায় আধকোশ রাস্তা হবে।' বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে জবাব দেয় সে।

এই অন্ধকারে এক মাইল রাস্তা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটা? ঊর্মিলা শিউরে উঠল, 'সে আমি পারব না! একা যেতে পারব না। তবে তুমি যদি যাও—'

'আমি ত যাবো না।'

'কেন? তোমার বাড়ি কোথায়? গ্রামের মধ্যে না?'

মাথা নেড়ে ছেলেটা জবাব দেয়, 'গ্রামে বাড়ি আছে, তবে বাড়িতে কেউ নেই, আমি এইখানেই থাকি। ঐ যে পথের পাশে ঐ চালাটা, ওখানে। ওটা আমিই তুলেছি—' সগর্বে বলে সে।

চালাটা এত ছোট, এবং এমন ভাবেই বাঁশঝাড় ও কাঁঠাল গাছের মধ্যে ঢেকে আছে যে এতক্ষণ ঊর্মিলা দেখতেই পায়নি। এইবার ঠাউরে দেখলে। কিন্তু এখন উপায়?

হঠাৎ ছেলেটা প্রশ্ন করল,—'তোমার সঙ্গে মরদ ছাওয়াল কেউ নেই? কেমনতরো মেয়েছেলে তুমি!'

রাগে ঊর্মিলার মুখ লাল হয়ে উঠল, কান দুটো হয়ে উঠল গরম। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'আমরা শহরের মেয়ে, আমাদের সঙ্গে পুরুষ দরকার হয় না, আমরা একাই যেতে পারি! দেশের কাজ করে বেড়াই আমরা জানো না? পুলিশ পর্যন্ত আমাদের ভয় করে।'

'তবে গ্রামে চলে যাও না সোজা। ভয়টা কি?'

ঊর্মিলা টপ্ করে উত্তর দিতে পারলে না। একটু ইতস্তত করে বললে, 'বাঘের ভয় আছে যে! নইলে—আচ্ছা, তুমি আমাকে পৌঁছে দাও না?'

মাথা নেড়ে বললে সে, 'সে আমি পারব না। আমার বুঝি বাঘের ভয় নেই!'

তারপর আরও একটু চুপ করে থেকে কী ভেবে সে বললে, 'আমার ঘরে থাকবে রাত্তিরে? এখন আর কোথায় যাবে নইলে?'

ততক্ষণে অন্ধকার বেশ ভাল করেই নেমেছে। নিবিড় নিস্তব্ধ বনের মধ্যে দিয়ে বাসের রাস্তাটা বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে বনের মধ্যে হারিয়ে গেছে। কোথাও কোন লোক নেই—লোকালয়ও নেই। এমন করে ত থাকা যায় না। আশ্রয় একটা চাই-ই, যেমন করে হোক। প্রায় মরীয়া হয়েই ঊর্মিলা বললে, 'চলো, তাই যাবো।'

নিতান্তই ছোট একটা কুঁড়ে—সামনে মাটির দাওয়া এক ফালি। ঘরের মধ্যেও আসবাবপত্র তথৈবচ। একটা খেজুর পাতার চ্যাটাই পাতা এক পাশে, তাতে একটা ময়লা কাঁথা এবং ততোধিক ময়লা ছেঁড়া বালিস পড়ে আছে। সেদিকে চাইলে গা বমি-বমি করে—এতই ময়লা

সেগুলো। ছেলেটা এক টান দিয়ে পায়ে করে কাঁথা-বালিসগুলো সরিয়ে দিলে, তারপর বললে, 'ব'সো। মুখ হাত ধুয়ে আসি আমি।'

একটা মাটির কলসী হাতে সে নিমেষে পিছনের বাঁশবনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। নিস্তব্ধ ঘর। বাইরেটা আরও শব্দহীন। কেমন যেন গা ছমছম করে ঊর্মিলার। সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার কাছে, ভেতরে এসে বসতে সাহসে কুলোয় না। একটু পরেই ঘরের মালিক ফিরে এল এক কলসী জল কাঁধে। ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে, 'ঐ! বসোনি যে! আরে ব'সো ব'সো—'

তারপর কী মনে হল ওর। একটু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে, 'ঘেন্না করে—না? শহরের মেয়ে তোমরা!' এই বলে হঠাৎ কোঁচা দিয়ে চ্যাটাইটা ভাল করে ঝেড়ে দিলে। তারপর বললে, 'এবার ব'সো। নয়ত মুখে হাতে একটু জল দিয়ে নাও।'

ঊর্মিলা মাথা নেড়ে বললে, 'কিছু দরকার নেই। ও তো পুকুরের জল? ওতে ম্যালেরিয়া হয়। ও জল মুখে দিতে পারব না।'

একটুখানি ভ্রূ কুঁচকে সে বললে, 'জল এ পুকুরের ভাল। সবাই খায়। তা, নদীর জল এনে দেব?'

'না, না, দরকার নেই। আমি এমনিই বসছি।'

সে জুতো খুলে কোনমতে চ্যাটাইটার একধারে বসে পড়ল।

তারপর একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। একটু পরে ঊর্মিলা প্রশ্ন করলে, 'ভোরে বাস্ আসে কখন্?'

'সে সেই যার নাম আটটা। ন'টায় ছাড়ে।' আরও একটু চুপ করে থেকে আবার বললে সে, 'তাই ত! ভারি মুস্কিলের কথা হল ত!'

'কী মুস্কিল?' ভীত চোখ তুলে তাকালে ঊর্মিলা।

'তুমি খাবে কী? মিষ্টির দোকান ত সব বন্ধ করে চলে গেছে।

আমার দোকানে আছে শুধু বিড়ি আর দেশলাই। লজঞ্চুস আছে বটে ক'টা। তা ত আর খেতে পারবে না।'

'আমার কিছু দরকার নেই। কোনমতে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলে বাঁচি।'

কিন্তু সেদিকে সে কোন কানই দিলে না। মনে মনে সে খানিকটা কি ভেবে নিয়ে বললে, 'আচ্ছা, আমি রান্না করব। তুমি কি আমার হাতে খাবে? আমরা কিন্তু ভাল জাত, গোয়ালা।'

তারপর যেন কতকটা খাপছাড়া ভাবেই বললে, 'আমার নাম রাজু। রাজু ঘোষ।'

ঊর্মিলা মাথা নেড়ে বললে, 'জাত-ফাত মানিনে অবশ্য আমরা। মানুষ মানুষই, তার আবার জাত কি! তবে আমার জন্যে কিছু রাঁধবার দরকার নেই।'

'সে কি একটা কাজের কথা হল। এতবড রাতটা কাটবে কিসে?' রাজু মাথা নেড়ে বিজ্ঞভাবে বললে, 'তবে আমাদের মোটা চালের ভাত— ঐ যা হয় করে দুটো খেয়ো।'

সে উঠে পড়ল। ঘরেরই এক কোণে একটা কাঠের উনুন, তার ওপর সিকেয় একটা পোড়া হাঁড়ি ঝোলানো। রান্নার সরঞ্জাম বলতে ত ঐ। আর এক কোণে দু'একটা হাঁড়িকুড়ি, বোধ হয় চাল ডাল থাকে। একখানা কলাইয়ের থালা আর এলুমিনিয়মের বাটি গোটা দুই—সংসার বলতে ওর মোটে এই।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে ঊর্মিলা হঠাৎ প্রশ্ন করলে, 'তোমার কেউ নেই?'

'না।'

'মা বাবা—কেউ না?'

'না।' বেশ সহজ কণ্ঠেই বললে রাজু—'মা ছিল, মরে গিয়েছে গত বছর। তার পর থেকেই আর বাড়ি যাই না।'

সে উঠে গিয়ে বাইরে কোথা থেকে কাঠ-কুটো, শুক্‌নো নারকেল ও খেজুর পাতা জোগাড় করে আনলে। কলসীর জল গড়িয়ে হাঁড়িটাও ধুলে। তারপর উনুনটা জ্বালাতে গিয়ে কিন্তু কী মনে করে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। একটুখানি চুপ করে থেকে বললে—'মূলেই ভুল! আমি খাই নুন-ভাত অর্ধেক দিন, সে ত আর তুমি পারবে না! ঘরে কিছুই নেই। হয়ত চারটি ডাল পড়ে আছে, কিন্তু শুধু ডাল দিয়ে···ঠিক হয়েছে, ব'সো, বাইরে থেকে গোটাকতক কাঁচকলা পেড়ে আনি—'

উর্মিলা বিষম ব্যস্ত হয়ে ওকে বাধা দিতে গেল। কিন্তু তার আগেই রাজু বেরিয়ে গেছে, তাছাড়া উর্মিলার এরই মধ্যেই ক্ষিধেটা যে রকম পেকে উঠেছে তাতে সারারাত নিরম্বু কাটানো কতটা যুক্তিযুক্ত হবে সে সম্বন্ধে এর মধ্যেই বেশ একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে ওর।···অবশ্য রান্নার যা সাজসরঞ্জাম তাতে খেতে ইচ্ছে করে না ঠিকই,—কিন্তু মনে মনে নিজেকে ধমক দেয় উর্মিলা, দরিদ্র ভারতবাসী, অসহায় মূর্খ ভারতবাসী ওদের ভাইবোন। তাদের সঙ্গে সহজে না মিশতে পারলে কিছুতেই তাদের উন্নতিসাধন করতে পারা যাবে না। দেশের কাজে যে জীবন উৎসর্গ করেছে তার এত ঘৃণা থাকা ঠিক নয়।

মিনিট কয়েক পরেই গোটা কয়েক সদ্য-পাড়া কাঁচকলা ও তিন চার থোলো ডুমুর নিয়ে রাজু ঘরে ঢুক্‌ল। হেসে বললে, 'এইতেই যা হয় হবে আজ। তবে তরকারি-ফরকারি আমি রাঁধতে জানিনে। ভাতেই ছেড়ে দেব—কেমন?'

হঠাৎ উর্মিলা উঠে দাঁড়াল। বললে, 'আমিই রাঁধছি রাজু। তুমি আমাকে একটু জোগাড় করে দাও।'

রাজু বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'সে কি কথা! সে তুমি পারবে না। শহরের লেখাপড়া-জানা মেয়ে তোমরা, উনুনের ধারে যেতে পারো কখনো। হয়ত কাপড়ে আগুন ধরিয়েই ফেল্‌বে।'

'কিচ্ছু হবে না। রান্না আমার অভ্যাস আছে।...তুমি ত রোজই রাঁধো, একটি দিন আমিই রেঁধে খাইয়ে যাই।'

এই বলে সে ভ্যানিটি ব্যাগটা বাঁশের একটা খোঁচায় ঝুলিয়ে রেখে শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিলে।

ঊর্মিলা রান্না করে আর রাজু অবাক্ হয়ে দেখে। বাস্‌-লাইনের ধারে দোকান করে সে, হরেক রকমের লোক আসে যায়, নানা রকমের কথা হয় সেখানে। তাতে সবটা ঠিক না জানলেও এইটুকু একটা আধ্‌ছা ধারণা ওর হয়েছিল যে, এই শ্রেণীর লেখাপড়া-জানা মেয়ে-মরদরা কোন কাজই জানে না, কিছুই করে না ওরা ঘরে। এখন ঊর্মিলাকে গুছিয়ে রান্না করতে দেখে ওর কেমন একটা বিস্ময় লাগে মনে মনে। অবশ্য কাঠের জ্বালটাতে ঊর্মিলার অসুবিধা হচ্ছে বটে—ধোঁয়াতে ওর ডাগর চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে, অনবরত ফুঁ পেড়ে পেড়ে মুখও হয়ে উঠেছে রক্তবর্ণ। চোখের জল আর কপালের ঘামের সঙ্গে মাথার দু-একটি চুল এবং নারকেল পাতার ছাই জড়িয়ে যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে।...মেয়ে-ছেলে বলতে রাজু যাদের দেখেছে তারা ওর সেই আত্মীয়া ও গ্রাম-বাসিনী। এ ছাড়া অন্য কোন মেয়ের দিকে এতদিন ভাল করে তাকিয়েই দেখেনি। শহুরে মেয়েদের সম্বন্ধে কানে যা শুনেছে তা মনে পৌঁছয়নি ওর। বন্য এবং সরল অনভিজ্ঞতাতেই অনায়াসে ও ঊর্মিলাকে 'তুমি' বলতে পারছিল, কোথাও বাধেনি। এখনও সেই সহজ সম্বোধনের মধ্যে কোন অসৌজন্যই খুঁজে পায়নি ও। তবু সবটা জড়িয়ে ওর মনে

একটা সম্ভ্রমের ভাব জাগে। আর এটা বেশ বুঝতে পারে যে এরা ঘর-কন্নার কাজ করে না বটে, তবে ইচ্ছে করলে সব পারে।

অবশেষে এক সময়ে রান্না শেষ হয়। রান্না ত ভারি। ভাত, ডাল আর একটা কাঁচকলা-ডুমুরের তরকারি। তা-ও হলুদ এবং কাঁচালঙ্কা ছাড়া কোন মশলা নেই। তবু ওর ভিতরেই গুছিয়ে রাঁধে উর্মিলা, এ যেন ওর-ও একটা নতুন অভিজ্ঞতা। কতদিন পরে রাঁধল ও—কিন্তু সেটাই সব নয়। যেখানে এবং যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যেভাবে ওকে রাঁধতে হল—সেটা যেন নিজে করেও বিশ্বাস হয় না। সব শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে ও বলে, 'এইবার একটু মুখ-হাত ধোওয়া দরকার—জলে ম্যালেরিয়া নেই ত? ঠিক জানো?'

রাজু যেন তন্দ্রার ঘোরে ছিল, হঠাৎ চমক ভেঙে বলে, 'না, ভাল জল। দাঁড়াও, আলো ধরি।'

কেরোসিনের কুপি হাত-আড়াল দিয়ে বাতাস বাঁচিয়ে বাইরে আনলে রাজু। ভাল করে মুখে হাতে জল দিয়ে ভেতরে এসে উর্মিলা প্রসাধন করতে বসে। ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর থেকে ছোট্ট আয়না বার ক'রে—দেখতে গিয়ে হাসি আসে ওর। এ কী ছিরি হয়েছে! ভাগ্যিস খদ্দরের শাড়িটা রঙীন ছিল, নইলে ছাই আর কালি লেগে যা হয়েছে, ভদ্রসমাজে আর বেরোনো যেত না।

সে পাউডারের পাফ্‌টা মুখে বুলোয়, চিরুনি দিয়ে চুল ঠিক করে,—অবাক হয়ে দেখে রাজু। এসব তার চোখে অভিনব, বিস্ময়কর। অত ফরসা মুখে পাউডার মাখবার দরকার কী ভেবে পায় না সে।

হঠাৎ ওর বিস্মিত চোখের দিকে নজর প'ড়ে অপ্রতিভ উর্মিলা চট্ করে ব্যাগটা বন্ধ করে বলে, 'হাঁ, এইবার তোমাকে ভাত দিই—কিন্তু থালা যে তোমার মোটে একটা। তাতেও তো তরকারি ঢেলেছি—'

'দাঁড়াও, পাতা কেটে আনি।' রাজু বঁটিটা নিয়ে অন্ধকারে পা বাড়ায়।

উর্মিলা চট্ করে উঠে গিয়ে ওর বঁটিসুদ্ধ হাতটা ধরে ফেলে বলে, 'না না, অন্ধকারে আর বেরিয়ো না।'

তারপরই অপ্রস্তুত হয়ে হাতটা ছেড়ে দিলে বটে, কিন্তু ওর সে লজ্জাটা বোধ হয় লক্ষ্যই করলে না রাজু, বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, 'কেন? কী হয়েছে?'

'যদি বাঘ থাকে বাইরে?'

'হ্যাঁ, এই সন্ধ্যারাত্রে বাঘ আসে কখনো! এই ত পেছনেই কলাঝাড়, এখনই আসছি, তুমি ব'সো।'

সে নির্ভয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু আসল ভয়টা উর্মিলারই। বাইরের নিঃসীম অন্ধকারের দিকে চেয়ে ওর বুক কাঁপে ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে। সেটা ঠিক বাঘের ভয় কি ভূতের ভয়, কি চোর ডাকাতের ভয়, তা ও জানে না।

যাই হোক্—রাজু প্রায় তখনই ফিরে এল কলাপাতা নিয়ে। নিজেই কেটে ধুয়ে পাত্‌লে ভাল ক'রে। উর্মিলা ভাত বেড়ে দিলে। বাটিতে ডাল আর পাতায় তরকারি। আয়োজন কম, সরঞ্জামও লজ্জাকর। কিন্তু ক্ষুধাটা উগ্র বলে ভালই লাগে উর্মিলার। রাজুর ত মনে হয় অমৃত। এত ভাল রান্না কতদিন সে খায়নি। উর্মিলার মত মেয়ে রান্না ক'রে কোনদিন ভাত বেড়ে খাওয়াবে এ ওর কাছে অসম্ভব। স্বপ্নেরও অতীত। সবটা কেমন অবাস্তব বলে মনে হয়, খায় সে কতকটা স্তম্ভিত ভাবেই।

খাবার পরেই শোবার সমস্যা। রাজুই বাসনগুলো এককোণে সরিয়ে রেখে ন্যাতা দিয়ে মেঝে পেড়ে নিয়ে পরিষ্কার করলে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কথাটা পাড়তে পারে না ও। অপরিচিতা

যুবতী মেয়ের সঙ্গে এক ঘরে শোওয়া কেন দোষাই বা লজ্জার তা সে ঠিক জানে না, তবে অস্পষ্ট একটা ধারণা আছে যে সেটা উচিত নয়। অথচ উপায়ই বা কি? অনেক ভেবেও যখন কিছু বুঝতে পারলে না, তখন প্রশ্নটা সোজাসুজি করেই ফেলল, 'শোবে কোথায় বলো ত?'

কথাটা উর্মিলাও ভাবছিল। সে মাথা নেড়ে বললে, 'আমি বসেই থাকব। তুমি শুয়ে পড়ো।'

রাজু বাইরের দিকে চেয়ে বললে, 'দোর বন্ধ করতে হবে কিন্তু।'

চম্‌কে উঠে উর্মিলা বলে, 'তা কেমন করে হবে। না না, দোর খোলা থাক্।'

'পাগল নাকি। শুধু কি বাঘ। কত রকম আছে। নইলে ত আমি বাইরেই শুতে পারতুম।'

বিপন্ন মুখে উনুনটার দিকে চেয়ে থাকে উর্মিলা। ঘুমও পাচ্ছে খুব, সারাদিন পরিশ্রম কম হয়নি, ঘুম পেতেই পারে।

রাজু বললে, 'তা এক কাজ করো। তুমি দোর বন্ধ করে শোও, আমি দোকানে গিয়ে শুচ্ছি।'

'না না।' সভয়ে বলে ওঠে উর্মিলা, 'একা থাকতে পারব না আমি।'

'তবে?' রাজু বুঝতে পারে না কি করা উচিত। খানিকটা চুপ করে থেকে বললে, 'তবে ঐ উনুন-গোড়ায় আমি শুচ্ছি মাটিতেই—তুমি ওখানে শোও। কী আর হবে, একটা রাত।'

সে সশব্দে দোর বন্ধ করে দেয়। উর্মিলা বললে, 'মাটিতে শোবার দরকার নেই, তোমার বিছানা তুমি নাও। আমি এখন বসেই থাক্‌ব। চ্যাটাইটা হলেই হবে।'

একটু মলিন হাসি দেখা দিল রাজুর মুখে, 'ও বিছানায় শুতে পারবে না জানি। বড্ড ময়লা। আচ্ছা, আমি সরিয়ে নিচ্ছি।'

সে কাঁথা বালিসটা টেনে নিয়ে ঘরের এক কোণে বিছিয়ে আর কথা না কয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু শোবার আগে আর একটি কাণ্ড করল সে—হঠাৎ এক ফুঁয়ে কুপিটা নিভিয়ে দিলে। এটার জন্য প্রস্তুত ছিল না ঊর্মিলা, অন্ধকার ঘরে একটা অপরিচিত যুবকের সঙ্গে শোওয়া—! অথচ, বলেই বা কি? সত্যিই ত, বন্ধ ঘরের মধ্যে কেরোসিনের ল্যাম্প সারারাত জ্বালা ঠিক নয়, তা ছাড়া কেরোসিনে আজকাল বিশেষ টান পড়েছে, সব সময়ে পাওয়া যায় না।

ঘর অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী যেন একটা ঠাণ্ডা ভাব ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। সেটা ভয়ই, কিন্তু কিসের ভয় তা সে জানে না। এতদিন ধরে সে বহু লোকের সঙ্গে মিশেছে—খানিকটা মানুষ চেনবার ক্ষমতা হয়েছে তার। সাধারণত পুরুষের চোখে সুশ্রী স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে উদগ্র ক্ষুধা ও লালসা ফুটে ওঠে, এর চোখে তা নেই, সরল বন্য চাহনি। না, সে ভয় নেই। তবু, কিসের একটা ভয় বা উত্তেজনা অনুভব করে সে, ওর বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। আর সেই অন্ধকারেই, ওর মুখ-চোখ যে লাল এবং গরম হয়ে উঠেছে—তা বুঝতে পারে।

তবু ঊর্মিলাই ঘুমিয়ে পড়ে আগে। বসে থাকতে থাকতে কখন্ যে শ্রান্তিতে চোখের পাতা বুজে আসে তা ও বোঝে না, এক সময় ভ্যানিটি ব্যাগটা মাথায় দিয়ে চ্যাটাইয়ের উপর শুয়ে পড়ে।

কিন্তু রাজু যেন কিছুতেই ঘুমোতে পারে না। আশ্চর্য! আজ কী হল ওর? সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর অন্যদিন ত শুতে তর্ সয় না। কি একটা উত্তেজনা আর অস্বস্তি যেন দেহের ভিতর, ওকে কিছুতেই স্থির থাকতে দেয় না। কি জন্য যে এমন হচ্ছে তাও ও বোঝে না।

চুপ করে জেগে শুয়ে থাকে রাজু। ঊর্মিলা যে এতক্ষণ বসে ছিল, এইবার শুয়ে পড়ল—তা ও বেশ বুঝতে পারে। একটু পরেই তার নিশ্বাসের শব্দ গভীর এবং নিয়মিত হয়ে ওঠে। ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারী। ভদ্দরলোকের মেয়ে ওরা, এই মাটির ঘরে, চেটাইয়ের ওপর শোওয়া কি ওদের কাজ!···কেমন যেন মনে মনে একটা লজ্জা অনুভব করে রাজু. ওর দারিদ্র্যের জন্য—অপরিচ্ছন্নতার জন্য। ঠিক করে কিছু বোঝে না ও—অত স্পষ্ট ধারণাও নেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে—তবু একটা সঙ্কোচ, একটা লজ্জা। ওযে দরিদ্র—তার চেয়েও বেশি, ওযে নোংরা, অপরিচ্ছন্ন—এই অনুভূতিটা প্রথম ওর জীবনে এল। হয়ত খানিকটা ঝাপসা ভাবে, তবুও এল। ও যা পয়সা রোজগার করে, তাতে খেয়ে প'রে বেশি কিছু থাকে না বটে, তবু চেষ্টা করলে একটা তক্তপোষ কিংবা একটা বাঁশের মাচা অন্তত তৈরি করাতে পারত। আর কিছু না হোক,—সোডা সাজিমাটি দিয়ে কাঁথাখানা কাচাও চলত। কিছুই করেনি সে—এ সম্বন্ধে কোন ধারণা পযন্ত ছিল না ওর। আজ সেজন্যও যেন সে লজ্জিত।

কদিন ঝড়বৃষ্টি হয়ে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল, কিন্তু এখন যেন কেমন গরম বোধ হচ্ছে—হয়ত সেইজন্যই ঘুম আসছে না। রাজু হাতটাই পাখার মত নেড়ে একটু হাওয়া খেতে থাকে। ঘরে জানালা নেই, দক্ষিণ দিকে খানিকটা চারকোণা জায়গায় শুধু ছিটে-বাঁশ, মাটি ধরানো হয়নি—সেইটেই জানালা বলে ধরা হয়। কিন্তু তাতে আর যাই হোক ঘরে হাওয়া আসে না। একটা পাখা কিনে রাখা উচিত ছিল, এটাও কি মনে থাকে না ছাই! হয়ত মেয়েটারও কষ্ট হচ্ছে গরমে—পাখা থাকলে ত এখন ও একটু হাওয়া করতে পারত।

আচ্ছা, রাজু ত নিজের নাম ওকে বলে দিলে, কিন্তু ওর নাম ত জানা হল না! কী নাম কে জানে। কোথায় থাকে তাই বা কে

জানে—বললে ত, কলকাতায়।···বললে ত দেশের কাজ করে। দেশের কাজ যে কী তা রাজু জানে না, শুনেছে যে একদল মেয়েপুরুষ স্বদেশী করে বেড়ায়—হয়ত তাকেই দেশের কাজ বলে।

রাজুর বাবা ছিল ঘরামি, দিন আনত দিন খেত। যখন সে মরে গেল তখন ছ'বছরের রাজুকে মানুষ করতে ওর মাকে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়েছে। পাড়াগাঁয়ে, বিশেষ করে এই অঞ্চলটায় ঝি-চাকরের কোন মজুরিই ছিল না আগে। খুব বড় গৃহস্থ হলে তারা ঝি রাখত—এবং সে ঝি অতগুলি লোকের সমস্ত বাসন মাজা, বাড়ির পাট, মায় গোরু-বাছুর পর্যন্ত দেখলে, হয়ত পেত খোরাকি আর এক টাকা মাইনে। সে জায়গায় একটা ছেলেকে সুদ্ধ খাওয়াতে কী অসম্ভব পরিশ্রম করতে হ'ত তা সহজেই বোঝা যায়। সুতরাং, রাজু যখন মাত্র বছর-দশেকের তখনই সে বেরোয় রোজগার করতে। রোজ এতটা পথ হেঁটে এসে এখানে সুরেনের দোকানে বিড়ি পাকাত। তাতে মজুরি পেত যৎসামান্যই—কিন্তু তখনকার দিনে খরচও ছিল কম। কোনমতে মা-বেটার চলে যেত। তবু খাটতে হ'ত বৈকি। দিনরাত ঘাড় গুঁজে বিড়ি পাকিয়ে যাওয়া, কোন দিকে মাথা তুলে তাকাবার কিংবা কান পেতে কোন কথা শোনবার সময় ছিল না ওর। তারই ভেতর ও পয়সা জমিয়ে, কিছু বা ধার ক'রে নিজের দোকান দিলে একদিন। সে দেনা শোধ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর মায়ের হল অসুখ। এদেশে অসুখ করলে গরিব লোকেরা কখনও ডাক্তার ডাকে না, ডাকে রোজা, সে এসে ঝাড়ফুঁক করে দেয়। তাতেই যে বাঁচে সে বাঁচে—যে বাঁচে না, ওরা বোঝে তার পরমায়ু নেই। কিন্তু রাজু তার মায়ের জন্য ডাক্তার ডেকেছিল। অবিশ্যি ওর মা তাতে বাঁচল না, কিন্তু আবার কিছু দেনা হল। সে দেনা শোধ ক'রে এখানে ঘর তুললে রাজু—তার দেনাটা

এখনও শুধছে।...তাই, বয়স ওর কুড়ি-একুশ হ'লেও জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ওর খুব কম। স্ত্রীলোকের দিকে ত তাকাতেই সময় পায়নি। ওর বয়সী, এমন কি ওর চেয়ে কমবয়সী যে সব ছোকরারা ওর আশেপাশে থাকে, অন্য দোকানে কাজ করে, তারা ইতিমধ্যেই সিনেমা ও বেশ্যাপল্লী ঘুরে বিস্তর অভিজ্ঞতা ও কুৎসিত ব্যাধি সংগ্রহ করে এনেছে. কিন্তু রাজু সে অবসর পায়নি। এমন কি, এক বিড়ি ছাড়া অন্য নেশাও করেনি ও। একদিন সবাই ওকে জোর ক'রে তাড়ি খাইয়েছিল—ওর ভাল লাগেনি একটুও। বমি ক'রে মাথা ঘুরে অস্থির। পরের দিন অবধি মাথা ধরে ছিল। পয়সা খরচ ক'রে এমন নেশা করার দরকার কি, রাজু তা বোঝে না—বিশেষত যাতে এত শরীর খারাপ করে। সে আর কোনদিন তাড়ি খায়নি।

কতকটা সেইজন্যই—রাজু আজ বুঝতে পারে না, এ ওর কিসের অস্বস্তি! ঘুম ওর চোখে কেন আসছে না! গরম হচ্ছে বটে একটু, কিন্তু এর চেয়েও ঢের গরমে ও এই ঘরে ঘুমোয়, বাইরে শোওয়া ত কোনদিনই চলে না এখানে।

তবে?

কোন জবাবই পায় না—নিজের উপরই যেন বিরক্ত হয়ে ওঠে। আচ্ছা, মেয়েটি কী ক'রে ঘুমোচ্ছে এই গরমে? নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে খুব। কী ক'রে শুয়েছে বেচারী কে জানে—একটা বালিস পর্যন্ত নেই। একবার দেখবে নাকি ও আলো জ্বেলে?

যখন রাঁধছিল ও, রাজু তখন দেখেছে বটে—বেশ ভাল লাগছিল ওর, যাই বলো বাপু। আর একবার ওর দেখতে ইচ্ছে করছে খুব। তা ছাড়া, দেখাও ত উচিত, শুধু চ্যাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছে, কতদিন এই চ্যাটাইয়ের নিচে থেকে ও বিছে বার ক'রে মেরেছে—!

আস্তে আস্তে উঠে রাজু দেশলাই জ্বেলে কুপিটা ধরালো। অগাধে ঘুমোচ্ছে উর্মিলা, আলো জ্বালার শব্দে ঘুম ভাঙল না। কতকটা ভয়ে-ভয়েই জ্বেলেছিল রাজু—কে জানে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে কী মনে করবে ও!

দুটো শয্যার ব্যবধান খুব বেশি নয়—ঘরই বা কতটুকু! ওর বিছানা থেকেই বেশ দেখা যাচ্ছে উর্মিলাকে। আহা, বেচারী! ভ্যানিটি ব্যাগটা বালিসের মত করেছে বটে, কিন্তু সে বড় নিচু, তাই একটা হাতও মাথার নিচে দেওয়া আছে। গরম বোধ হয়েছে ওর-ও—কপালে, গলায়, ঠোঁটের ওপর মুক্তোর মত ঘাম জমে উঠেছে। ব্লাউজের মধ্যে থেকে কাঁধ বেরিয়ে পড়েছে খানিকটা—সেখানেও।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে রাজু। মেয়েছেলে এমনি কিছু কিছু দেখেছে সে দূর থেকে, বাস্ থেকে নেমে কত শহরের মেয়েকে দেশে যেতে দেখেছে। কিন্তু এত ভাল দেখতে তারা নয়। ঠিক সুন্দর কাকে বলে তা রাজু জানে না—তবে ওর ভাল লাগে এ'কে দেখতে। সুগোল হাতটি ভাঁজ হয়ে কাঁধের নিচে চলে গেছে—উর্মিলা ঠিক ফরসা নয়, কিন্তু রাজুর চোখে গৌরবর্ণ-ই লাগে—শুভ্র নিটোল বাহুমূল, দেখলে যেন চোখ ফেরানো যায় না। পাতলা ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে, তার মধ্যে থেকে সাদা সাজানো দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে। নিয়মিত নিশ্বাস পড়ার তালে তালে বুকটি উঠছে ফুলে ফুলে। নিশ্চিন্ত সহজ নিদ্রা।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে কেন কে জানে—যেন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে, কতকটা ওর অজ্ঞাতসারেই। বেদনা-বোধের, অভাববোধের কোন কারণ যে থাকতে পারে তা ও জানে না—তবু নিশ্বাস ঠেলে ওঠে ওর বুক থেকে।…অবশেষে আবার আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

উর্মিলার ঘুম ভাঙে একটু বেলাতেই। তা ব'লে এই রকম স্থানে, এই শয্যাতে যে ও এতটা ঘুমোতে পারে তা কে জানত! সে ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে যখন উঠে বসল তখন চারিদিক বেশ ফরসা হয়ে গেছে। ছিঃ ছিঃ, এইখান থেকে এত বেলায় যদি কেউ তাকে বেরোতে দেখে সে কী মনে করবে! কাল যখন নিরাপদ আশ্রয়টাই বড়কথা হয়ে উঠেছিল তখন একরকম মরীয়া হয়েই এসব প্রশ্নগুলোকে মন থেকে সরিয়ে দিয়েছিল উর্মিলা। কিন্তু এখন সমস্ত ব্যাপারটার গ্লানি যেন ওকে মনে মনে পীড়া দিতে লাগল। তবু ভাগ্যিস ঐ ছোঁড়াটা নেই! ও কখন ভোরেই উঠে বেরিয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি বেশ-বাস ঠিক ক'রে নিয়ে উর্মিলা বাইরে এল। বেশ বেলা হয়েছে, যদিও ঠিক রোদ ওঠেনি এখনও। তবে একটা সুবিধা, এখনও লোকজন রাস্তায় দেখা দেয়নি, দোকানগুলোও বন্ধ।...সে বেরিয়ে ইতস্তত করছে কী করবে, বাগানের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল রাজু। বেশ সহজ ভাবেই বললে, 'ঐ পেছনটার বাগানে কেউ নেই, পুকুরের জলও ভাল। মুখ-হাত ধুয়ে এসো গে। আমি দোকানে যাচ্ছি। তুমি ঘরেই ব'সো, মটর এলেই ডাকব।'

ছেলেটার যা মুখের চেহারা তাতে ওর 'তুমি' সম্বোধন কাল মোটেই বেমানান্ লাগেনি, আজও ঠিক লাগল না—তবু এই অন্তরঙ্গতায় ওর মনে যেন একটা বিরক্তি ঘনিয়ে উঠল। ঈষৎ ভ্রূ কুঁচকে সে বললে, 'ঘরে বসার আর দরকার হবে না, আমি নদীর ধারে পায়চারি করব যতক্ষণ না বাস্ আসে। ঘরে তুমি তালা লাগিয়ে যেতে পারো।'

রাজু খুব আস্তে আস্তে জবাব দিলে, 'আচ্ছা'। ওর মনে কালকের বিনিদ্র-রজনী অনেক পরিবর্তনই ঘটিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে। ও বুঝেছে যে, যে কোন কারণেই হোক্—উর্মিলার মত মেয়ের পক্ষে ওর ঘরে

ঐ চ্যাটাইয়ের উপর বসা শুধু কষ্টকর নয়, লজ্জাকরও বটে। এমন অতিথির মত কোন আয়োজনই ওর ঘরে ছিল না, আতিথ্য-সৎকারের কোন ব্যবস্থাই ও করতে পারেনি—এই ধিক্কার ওকে মনে মনে এমনিতেই পীড়া দিচ্ছিল। ও আর কথা বাড়ালে না, নিঃশব্দে এসে ঘরটাতে তালা লাগিয়ে দোকানের পথ ধরলে। কেমন করে রাজু মনে মনে নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল যে, এই মেয়েটিকে কোন রকম স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া আর ওর পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং বৃথা কোন অনুরোধ করতে ওর মন সরলো না—নিঃশব্দে অবস্থাটাকে ও মেনে নিলে।

উর্মিলা পুকুর থেকে মুখ হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলে। কাঁচা ঘাট। তালগাছের গুঁড়িতে পা দিয়ে নামতে হয়। তবু—ঘাটটা খুব নির্জন। চারিদিকে নিবিড় বন—কোথাও থেকে কারুর দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা নেই। সে ব্যাগ খুলে চুলটা ঠিক ক'রে মুখে একটু পাউডার দিয়ে কাপড়টা গুছিয়ে পরলে। শাড়িটাই তাকে সবচেয়ে পীড়া দিচ্ছিল—অথচ বদলাবারও কোন উপায় নেই। একটা ছোট সুটকেস্ তার সঙ্গে ছিল বটে, কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে আসবার সময়ে সে-বোঝাটা চাপিয়েছে পূর্ণেন্দুর ওপর। পূর্ণেন্দুর অবশ্য আজই আসবার কথা—তবে সে যেন সকালে না আসে—মনে মনে এইটেই প্রার্থনা করছে উর্মিলা, শাড়ির প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও। পূর্ণেন্দু এলেই বিপদে পড়তে হবে, জবাবদিহি শুরু হবে নানা রকমের। তাকে বলতে হবে রাত্রির আশ্রয়ের কথাটা—সে ত হাসাহাসি করবেই, কথাটা পাঁচ কানে ছড়িয়ে পড়বে। সকলেরই উপহাসের খোরাক হয়ে উঠবে ব্যাপারটা। আর পূর্ণেন্দু না এলে বাসে উঠে বসবে, সকলেই মনে করবে যে সে ভোরেই এসেছে নৌকো বেয়ে।

উর্মিলা তাড়াতাড়ি রাস্তায় এসে উঠল। রাজু তখনও দোকান খোলে নি, সুরেনের দোকানের সামনে বেঞ্চিটাতে চুপ ক'রে বসে আছে।

ভালই হয়েছে কেউ আসেনি। অবশ্য রাজু গল্প করবে—কিন্তু যাদের কাছে সে করবে তাদের হাসিঠাট্টাটা আর যা-ই হোক ওর স্তরে এসে পৌঁছবে না।

উর্মিলা কাছে আসতে রাজু উঠে দাঁড়াল। ভেবেছিল কিছুই বলবে না, তবু একবার সসংকোচে সে বললে, 'এখানে বসবে একটু? আমি এখনই উঠে যাবো।...দোকান খুললে চা কেক্ সব পাওয়া যাবে।'

উর্মিলা মাথা নেড়ে বললে, 'না, কিছু দরকার নেই। আমি একটু পায়চারিই করব।' তারপর হঠাৎ কী মনে ক'রে ব্যাগটা খুলে একটা টাকা বার ক'রে বললে, 'রাজু, এই টাকাটা রাখো, মিষ্টি কিনে খেয়ো।'

রাজু টাকাটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই এক পা পিছিয়ে গিয়েছিল—একটা তীব্র প্রতিবাদও ওর গলা অবধি ঠেলে উঠেছিল—তবু ঠিক গুছিয়ে কিছু বলতে পারলে না। খানিকটা বিবর্ণ মুখে উর্মিলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে টাকাটা শেষ পর্যন্ত হাত পেতেই নিলে। ও কিছুই করেনি, কোন রকম যত্নই করতে পারেনি—বরং উর্মিলা যে ওর ঘরে দয়া করে থেকেছে রাত্রিটা, এইতেই ও চরিতার্থ হয়েছে, পুরস্কারের কোন কারণ নেই, প্রয়োজনও নেই—বোধ হয় এম্‌নি কিছু ও বলতে চেয়েছিল, কিন্তু বলতে সাহস হ'ল না। মলিন কাগজের টাকাটা হাতের মধ্যে মুঠো ক'রে ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাজু। উর্মিলা ততক্ষণে নদীর পাড় বেয়ে জলের কাছে নেমে গিয়েছে।...

অবশেষে আরও ফরসা হ'ল। দোকানপাট খুলল একে একে, এক সময়ে বাস্-ও এল। উর্মিলার বরাত ভালই—পূর্ণেন্দু বাস্ ছাড়ার সময়ের মধ্যে এসে পৌঁছতে পারলে না। খুব সম্ভব সে বিকেলের বাসে আসছে। আরও একটা আশঙ্কা উর্মিলার ছিল, বাস্ ছাড়ার সময়ে রাজু আবার না এসে আত্মীয়তা শুরু ক'রে দেয়। কিন্তু ছেলেটার বুদ্ধি-সুদ্ধি ভালই, সে

একবারও সে-চেষ্টা করলে না, এমন কি সামনে দিয়ে আসবার সময়ও চোখ তুলে চাইলে না। তবু—বাস্ ছাড়তে উর্মিলা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বাসের মধ্যে বসে দূরের পারঘাটার দিকে চেয়ে চেয়ে এখন বরং কাল রাত্রের কথাটা মনে হয়ে ওর হাসিই পেতে লাগল। ভয়ে মানুষ কী জন্তুই হয়ে যায়! ছিঃ!

বাস্‌খানা ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজু জোর করে স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে গা-নাড়া দিলে। কাজ-কর্ম ঢের পড়ে রয়েছে। সে শুধু ওর নিজের দোকানের জন্যেই বিড়ি পাকায় না, ওর বিড়ি পাইকারীও কাটে খুব। সন্ধ্যার বাস্ ছাড়ার আগে পাইকাররা এসে যাবে—তার আগে কাজ সেরে রাখা দরকার। নিজে কাজ করে, তা-ছাড়া একটা ছোকরাও রেখেছে ও।—সে ছেলেটা এসে বসে আছে সকাল থেকে, তাকেও কাজ বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

কেষ্টকে কাজ বুঝিয়ে দিলে বটে, কিন্তু নিজে কিছুতেই সেদিন কাজে মন দিতে পারলে না। কী সব এলোমেলো চিন্তা মনে আসে তাও ঠিক বোঝে না। কিসের একটা আলস্য—কিসের একটা ক্লান্তি যেন। বোধ হয় কাল রাত্রে ঘুম হয়নি সেইজন্যেই এমন হচ্ছে। কতকটা নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে রাজু গিয়ে সকাল ক'রে স্নান করে এল। কিন্তু তাতে শুধু চোখে তন্দ্রাই এল বেশি ক'রে জড়িয়ে—কাজে উৎসাহ পেলে না।

অন্যদিন সন্ধ্যায় যে ভাত রাঁধে তারই কিছুটা জল দেওয়া থাকে, নুন লঙ্কা ও তেঁতুল দিয়ে দুপুরবেলা তাই খায় রাজু। কাল লজ্জাতে সে কথা উর্মিলাকে বলতে পারেনি, অথচ আজও ওর নতুন ক'রে রাঁধতে ইচ্ছা হ'ল না। মনোহরের দোকান থেকে দু-এক পয়সার তেলেভাজা খাবার খেয়ে ও দোকানেরই এক পাশে শুয়ে পড়ল। কেষ্ট ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা

করল, 'তোমার জ্বর আসছে নাকি রাজুদা?' ও শুধু সংক্ষেপে উত্তর দিলে, 'না।'

ঘণ্টা-দুই ঘুমিয়ে উঠে বেশ খানিকটা কড়া চা খেয়ে নিয়ে কাজে লাগল রাজু। চুপ ক'রে বসে থাকলে চলবে? যার যা! ভালই হয়েছে মেয়েটা একটা টাকা দিয়ে গেছে। ভাগ্যিস টাকাটা ফিরিয়ে দেয়নি বোকার মত। কতগুলো বিড়ি বেচলে তবে একটা টাকা লাভ হয়! ওরা বড়লোক, সখ ক'রে স্বদেশী ক'রে বেড়ায়—ওদের অভাব কি! পুলিশের ভয় নেই ওদের—বাঘের ভয়ে ম'লেন! বাঘ যেন পুলিশের চেয়ে বেশি ভয়ানক! হাসি পায় রাজুর এদের কাণ্ড দেখলে। এ'কেই বলে মেয়েছেলে।···যাক গে, ভয় পেয়েছিল তাই একটা টাকা রোজগার হল—আবার একবেলা রান্নার মেহনতটাও বাঁচল।

এলোমেলো নানা কথা ভাবতে ভাবতে এক সময়ে রাজুর গতি শ্লথ হয়ে আসে। যাই বলো, বড় কষ্ট হয়েছে বেচারীর কিন্তু! ঐ ঘরে ওদের কি সাতজন্মে শোওয়া অভ্যাস আছে, বিশেষ ঐ চ্যাটাই-এর ওপর! তার ওপর হাওয়া বাতাস নেই ঘরটাতে একটুও—গরমে কী কষ্টই পেয়েছে মেয়েটা। ও অবিশ্যি ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, অত টের পায়নি। কিন্তু, কষ্ট হয়েছে ঠিকই। কি রকম ঘেমেছিল রাজু ত তা নিজের চোখেই দেখেছে!···

কথাটা মনে পড়তেই ছবিটা মনের পর্দায় ভেসে ওঠে রাজুর। সুন্দর ললাটে, ওষ্ঠে, কণ্ঠে সেই বিন্দু বিন্দু ঘাম, আর সেই মুক্তোর মত দাঁত! হাত ওর আপনিই যেন থেমে আসে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকের কাছে মুচড়ে মুচড়ে ওঠে—যদিও সেটা রাজু বুঝতে পারে না, আপনার দিবাস্বপ্নে আপনিই তন্ময় হয়ে থাকে।

অবশেষে আবার এক সময়ে চৈতন্য হয়, জোর জোর হাত চালাতে

থাকে। না, ঘরে একটা চৌকি করতেই হবে—আর একটা বিছানা। সুরেনের দেনা প্রায় শোধ হয়ে এসেছে, চাইলে আরও দশটা টাকা দেবে বোধ হয়। দশ টাকায় হবে না কি? না হয় দু'একটাকা ও কারবার থেকে দিতে পারবে।

কিন্তু এখন আর চৌকি-বিছানাতে লাভ কি! ওর নিজের প্রয়োজন আছে কি না—এ কথাটা রাজুর একবারও মনে পড়ল না।

সন্ধ্যার সময়ে দোর খুলে ঘরে ঢুকে হঠাৎ ও থমকে দাঁড়িয়ে যায়। সকালে ওরা দুজনে ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে গেছে—সুতরাং ঘরের অবস্থাটা সেই মুহূর্তেই থেমে আছে। থম থম করছে ঘরের আব্‌হাওয়াতে সেই স্মৃতিই। মনে হচ্ছে ঊর্মিলা বেরিয়ে গেছে এইমাত্র! কেমন যেন মনে মনে একটা ধাক্কা খায় রাজু।

একটু পরে ঘরের মধ্যে ঢুকে ওর কাঁথা-বালিসটা চ্যাটাইয়ের ওপর জড়ো করে রাখতে গিয়ে নজরে পড়ল একটা মাথার কাঁটা—চ্যাটাইয়ের ওপরই পড়ে আছে। ঐ মেয়েটার নিশ্চয়, মাথা থেকে খসে পড়েছিল, সকালে দেখতে পায়নি। নিজের অজ্ঞাতসারেই নাকের কাছে তুলল রাজু; এ ওর সহজাত সংস্কার, হাত আপনিই যেন উঠে গেল। খুব মৃদু একটা কি সুগন্ধ, যে গন্ধ-তেল মাখে চুলে তারই। সারাদিনেও গন্ধটা যায়নি, আশ্চর্য! কী তেল কে জানে—আর তার কত দাম!··

অন্যমনস্ক রাজু কাঁটাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। ওর এই নিভৃত, অবজ্ঞাত, অকিঞ্চিৎকর জীবনে আজ যেন কী একটা বিপর্যয় ঘটে গেল—ওর মসৃণ, অক্ষত মনের মধ্যে এই সামান্য লোহার কাঁটাটা একটা যেন গভীর চিরস্থায়ী ক্ষতর সৃষ্টি করলে। পল্লীগ্রামে প্রকৃতির মধ্যে বাস করে ও, ফুলের গন্ধ চারিদিকে, তবু সেদিকে ও কোনদিন লক্ষ্যই করেনি। আজ একটা লোহার কাঁটার সৌরভ ওকে যেন ক্ষণকালের জন্য—হয়ত

বা বহুকালের জন্যই মোহগ্রস্ত করলে। ওর যে পৌরুষ ছিল সুপ্ত, যে যৌবন ছিল অস্বীকৃত—সেই পৌরুষ ও যৌবন আজ ওর জীবনে প্রথম ঐ কাঁটাটার স্পর্শে জেগে উঠল। সে জাগরণের আকস্মিকতায় আর প্রবলতায় ও বিহ্বল হয়ে পড়ল। সে কঠিন সুপ্তিভঙ্গের বেদনায় ওর হৃদয়ের রক্ত ছল্‌ছলিয়ে কেঁপে উঠল। ওর পড়াশুনো নেই, অভিজ্ঞতা আরও কম—ও কিছুই বুঝতে পারলে না, শুধু এইটে অনুভব করলে যে, ওর জীবনে আজ কী একটা বিপুল পরিবর্তন এল। আজ এমন কিছু একটা ঘটল যার নাম জানল না রাজু—তবু বোঝে যে এটা না ঘটলেই ভাল হ'ত। ওর নিশ্চিন্ত তুচ্ছ জীবনযাত্রায় কিছু না হোক, শান্তি ছিল; আজ বুঝি সেটাও গেল।···

অনেকক্ষণ পরে ওর একমাত্র জামার পকেটে কাঁটাটা সযত্নে রেখে দিয়ে রাজু কলসী নিয়ে ঘাটে গেল। সারাদিন খাওয়া হয়নি, সুস্থ শরীর ক্ষিধেতে ঝিম্‌ঝিম্ করছে। ভাত চড়ানো দরকার। কিন্তু কাঠকুটো জল সংগ্রহ করে ভাত র্‌াধতে বসে আবার ওর খারাপ লাগে। হাঁড়িটা মেয়েটি কাল ভাত দেবার পর কেমন যত্ন ক'রে ধুয়ে রেখে গেছে—ঐ চাল-ডালের হাঁড়িগুলোতেও তার হাতের স্পর্শ আছে লেগে। সত্যিই সারাদিন খেটেখুটে এসে আবার র্‌াধতে বসা বিড়ম্বনা। এ কি পুরুষ মানুষের কাজ? কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আবার রাজু মনকে ধমক্ দেয়—চিরকাল যা করে এসেছে আর চিরকালই যা করতে হবে তাতে অত অরুচি কেন? একদিনেই কি অভ্যাস বদ্‌লে গেল নাকি!···যদিই বা বিয়ে করে—তাদের ঘরের মেয়ে এসে আর কত গুছিয়ে সংসার করবে! সবাই নোংরা—জংলী।

ভাত রেঁধে খেতে বসল সে—শুধু নুন-ভাত। খানিকটা ভাত জল দেওয়া রইল নিত্যকার মত। অভ্যস্ত জীবনযাত্রাতে ফিরে যাওয়াই

ভাল। কিন্তু আজ সে ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে, অত ক্ষিদের পরও শুধু-ভাত যেন ভাল লাগে না। ঘরে ডাল ছিল, দুটি ভাতে দিলেও ত হ'ত। সে যেন জন্তু হচ্ছে দিন দিন। ভাত খেয়ে উঠে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল রাজু। তবে কাঁথাটা আর চ্যাটাইয়ের ওপর পাড়তে ইচ্ছা হ'ল না। বড্ডই ময়লা, সত্যি। ঐ ত মেয়েটা কাল শুধু চ্যাটাই-এর ওপরই শুয়েছিল—সে-ই বা পারবে না কেন। রাজু আন্দাজে আন্দাজে, মেয়েটা ঠিক যেখানে শুয়েছিল সেইখানে শুয়ে পড়ল। এটা ইচ্ছে করে নয়—নিজের অজ্ঞাতসারেই।

সেদিনও রাত্রে ওর ঘুম এল না; আগের দিন রাত্রে ঘুম হয়নি, তবুও না। হয়ত দুপুরবেলা ঘুমিয়ে উঠে অতটা চা খেয়েছে বলেই ঘুম আসছে না। অন্ধকার ঘরে জেগে শুয়ে শুয়ে ওর মন স্বাভাবিক ভাবেই কাল রাত্রের ঘটনায় ফিরে এল। ঐ কাঁটাটা যদি না থাকত তাহলে আজ অনায়াসে মনে হতে পারত যে সবটা অবাস্তব কল্পনা—স্বপ্ন। এতক্ষণে ওর মনে হ'ল যে, ও যেখানটাতে শুয়েছে ঠিক সেইখানটাতেই, এমনি করে হাতে মাথা রেখে শুয়েছিল মেয়েটা। তার খালি হাতখানা এইখানকার চ্যাটাইটাই ছুঁয়ে ছিল বোধ হয় সারারাত, যেখানে এখন ওর হাত আছে—হয়ত বা তার হাতের ঘামে এখানকার চ্যাটাইটা ভিজেই গিয়েছিল। এখনও ভিজে থাকা সম্ভব নয়, তবুও সে-দেহের অদৃশ্য কোন চিহ্ন এখনও যেন লেগে আছে ওখানে।

হঠাৎ ওর কী হ'ল, ধড়মড় ক'রে উঠে আলো জ্বাললে তাড়াতাড়ি। আলোতে ও যেন সেই চ্যাটাইটা পরীক্ষা করতে চায়। কিন্তু আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুল বুঝতে পারলে রাজু, শূন্য ঘরের নির্জনতা ওকে যেন নিঃশব্দে বিদ্রূপ ক'রে উঠল। লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন দুপুরবেলা ও একফাঁকে সুরেনকে প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা সুরেনদা, দেশের কাজ মানে কী গো ?'

সুরেন বিস্মিত হয়ে তাকাল ওর দিকে, 'কেন বল্ ত ?'

'না—এম্‌নিই। এম্‌নি জিগ্যেস করছি, বলো না।'

অনেকক্ষণ শূন্যভাবে তাকিয়ে থেকে সুরেন জবাব দেয়, 'কী জানি। ওকথা ত কখনও শুনিনি—তবে সব স্বদেশী করে বটে শুনেছি। তা—'

সাগ্রহে সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়ে রাজু বলে, 'হ্যাঁ', হ্যাঁ, ঐ হবে। তা স্বদেশী করাই বা কী ?'

এবার তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দেয় সুরেন, 'ঐ আর কি। কংগ্রেস না কী আছে না ? তারই মেম্বার হয় সব, তারপর জেল-টেল খাটে। মানে—সরকার বাহাদুর যে সব অন্যায় জুলুম করে ওরা তা মানতে চায় না। তাই জেল খেটে মরে। হাজার হোক, তারা রাজা, তাদের সঙ্গে কেন! ঐ যে রে, যারা ঐ খদ্দর-টদ্দর পরে! বন্দেমাতরম্ বলে চেঁচায়। মহাত্মা গান্ধী আছেন—তিনিই নাকি ওদের ঐ সব করতে বলেন।'

কথাটা রাজুর ভাল লাগল না। যারা পুলিশের ভয় করে না তারা যে খুব সহজ লোক নয়—এটা ওর ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও ও বুঝতে পারে। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'সেদিন তারিণী-দা বলছিল যে, যারা স্বদেশী করে তাদের মধ্যে যে যতবার জেল খাটে তার তত খাতির। কেন বলো দেখি ?'

এবার সুরেন কিছু বিব্রত হয়ে পড়ল। ঢোঁক গিলে বললে, 'মানে, ওরা তো আর চুরি-ডাকাতি করে জেল যাচ্ছে না—তাই আর কি! ওরা যায় শুধু শুধু—সখ ক'রে। অতখানি কষ্ট সহ্য করছে ইচ্ছে ক'রে, সহজ ত নয়!'

রাজু বুঝতে পারে যে, সুরেনের কাছে এর আর কোন জবাব

পাবার সম্ভাবনা নেই। আরও খানিকটা চুপ করে থেকে সে বলে, 'আচ্ছা ঐ যারা স্বদেশী করে তাদের তুমি চেনো?'

ওর অজ্ঞতায় এবার স্থরেনও হেসে ফেলে। বলে, 'দূর্ পাগল—সে কি একটা দুটো যে, চিনে রাখব? সব জায়গাতেই দু'চার জন করে আছে। এই ত আমাদের গাঁয়ের চক্রবর্তীদের ছোট ছেলেটা, এখনও জেল খাটছে, কত বছর হয়ে গেল কিছুতেই ছাড়ছে না। তারপর কেশব মাষ্টার, দেঁতো হরিশ—সবাই ত স্বদেশী করে। কেন, তুই শুনিস্‌নি?'

রাজু সত্যিই শোনেনি অত গরজ ক'রে। এতদিন তার প্রয়োজনও হয়নি। তার জগৎ ছিল শুধু বিড়ি, বিড়ির পাতা, স্থরেনের দেনা—এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঘাড় গুঁজে কাজ করেছে, কোন দিকে তাকায় নি। আজও যে কী প্রয়োজন জানবার—ও তা বোঝে না, কিসের এ তাগিদ মন থেকে ঠেলা দিচ্ছে অনবরত! শুধু বোকার মত স্থরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।...

পরের দিন বাস্‌-ড্রাইভার তারিণীকে পাকড়াও করলে রাজু। বড় করে দুটো বিড়ি পাকিয়ে ওর হাতে দিয়ে প্রশ্নটা করলে। তারিণী নিত্য শহরে যায়, শহরেই থাকে বলতে গেলে—ও অনেক জানে-শোনে। আর তারিণী বলেও ঠিক-ঠিক। সাধারণত ইস্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরাই স্বদেশী ক'রে বেড়ায়। অনেকে অবিশ্যি দেশের কাজ করতে গিয়ে পড়া ছেড়েও দিয়েছে। তাদের মাথার ওপর নেতারা আছেন। এই যে গরীব লোকরা খেতে পাচ্ছে না, এইযে পুলিশরা ঘুষ নেয়, এইযে সাহেবরা যা খুশি তাই করে—এরই জন্যে লড়াই চালাচ্ছেন তাঁরা। এই সব অনাচার বন্ধ করতে চান। এসব কিছু থাকবে না, ওরাই রাজত্ব শাসন করবে, মানে পাঁচজনে মিলে মিশে, পাঁচজনে যা বলবে তাই হবে।

রাজা তা হতে দিতে চান না, তাই এত গোলমাল, তাই সবাই বারবার জেল খাটে, আটক থাকে, মার খায়।

মুগ্ধ হয়ে শুনছিল রাজু। এইবার বলে ফেললে, 'আচ্ছা তারিণীদা, যারা এই সব করে তুমি তাদের চেনো?'

তারিণীও হাসে। বলে, 'ক'টাকে চিনব বল। সেকি দুটো একটা! আমাদের দেশে-ঘাটে যারা আছে তাদের সবাইকে চিনি বটে।'

'সে আমিও চিনি,'—বাধা দিয়ে বলে রাজু। 'ঐযে কলকাতা থেকে যারা আসে মাঝে মাঝে তাদের চেনো?'

'সে ত নিত্য আসছে কত দল। সকলকে কি আর চিনে রাখা যায়?'

আর একটু ইতস্তত করে রাজু কথাটা বলেই ফেলে। 'আচ্ছা, ঐ যে পরশুর আগের দিন যারা এসেছিল, তাদের চেনো? পরশু সকালের গাড়িতে চলে গেল?'

'কে জানে, অত লক্ষ্য করিনি।' তারিণী উঠে পড়ে, 'স্থরেনদা, ভাল করে জমিয়ে এক কাপ চা করো দিকি!' তার আগ্রহ ঐ দিকে। কেন রাজু এত প্রশ্ন করছে এ কৌতূহলও নেই।

তারপর থেকে রাজুর যেন এইটেই হয়ে পড়ল এক নেশা। শহরের লোক পেলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে। কেউ বিরক্ত হয়—কেউ বা জবাব দেয়। প্রায় সকলেই কিছু কিছু ভুল বলে—কারুর সঙ্গে কারুর কথা মেলে না। অজ্ঞ, মূর্খ রাজু সে-সব তথ্যের সমুদ্রে দিশাহারা হয়ে যায়, মনে মনে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করে। যে কথা দু'তিনজন লোকের মুখে একইভাবে শোনে, বুঝতে পারে সেই কথাগুলোই সত্যি। এইভাবে এখানে কোথায় কোথায় কে আছে, কী কাজ হয়, তার মোটামুটি বিবরণ সে পেয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে কোথাও সেই মেয়েটির বর্ণনা মেলে না—

যার খবর ও জানতে চায়। শহর থেকে যতবার বাস্ আসে, ও সব কাজের ফাঁকে বাইরে এসে দাঁড়ায় ; যখন খদ্দেরের ভিড় থাকে, বাইরে দাঁড়াতে পায় না, তখনও একটা চোখ ও বাইরেই মেলে রাখে। কিন্তু সে আর আসে না—সত্যি সত্যিই সে যেন স্বপ্ন, সে যেন প্রলাপ—বোধ হয় সে পৃথিবীতে কোথাও নেই, রাজু বিকারের ঘোরে ভুল দেখেছিল! এইটে ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেও সে নিশ্চিন্ত হত—তাও পারে না, সেই লোহার কাঁটাটা যেন ওর বুকের মধ্যে, ওর সমস্ত চিন্তার মধ্যে খচখচ করতে থাকে। ওর দিনরাতের সমস্ত ভাবনার মধ্যে গভীর ভাবে বিঁধে থাকে। কাঁটাটা যে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কিন্তু দেখা পেলে যে কী হবে তা রাজু জানে না। হয়ত সে আর চিনতেও পারবে না। অন্তত আর যে ওর ঘরে আশ্রয় নেবার তার দরকার হবে না এটা ঠিক, তবু রাজুর সমস্ত মন যেন একাগ্র হয়ে তপস্যা করে। ও লেখাপড়া শেখেনি, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখার ক্ষমতা ওর নেই, এমন কি সে ব্যাপারের অস্তিত্ব পর্যন্ত জানে না—শুধু জানে যে একটা দুর্বার শক্তি ওর মনকে টানছে ঐ দিকে, একটা অন্ধ আবেগ, একটা তীব্র ইচ্ছা অহরহ ঐ মেয়েটির চিন্তার মধ্যে ওকে অনুক্ষণ টেনে রাখছে। সে আকর্ষণকে বাধা দেবার ওর শক্তিও নেই, ইচ্ছাও নেই।

এধারে ওর কাজের ক্ষতি হয়। খদ্দেররা মাল পায় না ঠিক সময়ে। কেষ্ট ফাঁকি দেয়, মশলা চুরি করে—সুরেনদা টাকার তাগাদা দেয়। সবই বোঝে, মাঝে মাঝে অনুতপ্ত হয়ে ওঠে। দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগে। কিন্তু, কিছুদিন না যেতে যেতেই আবার একটা ক্লান্তি অনুভব করে। কেমন যেন ঝিমিয়ে আসে। আজকাল ঘরে যাওয়া ও প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। অর্ধেক দিনই দোকানের মধ্যে কোনমতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকে—নয়ত সুরেনদার দোকানের বেঞ্চে। ভয়-ডরও চলে গেছে ওর। বাইকে

শুতে কিছুমাত্র ভয় করে না। তবু ঘরেরও পরিবর্তন হয়েছে নানা রকম। ভাল করে ছ্যাঁচা বাঁশ দিয়ে একপাশে একটা তক্তপোষের মত মাচা বাঁধা হয়েছে। তাতে চটের মধ্যে খড় পুরে গদি। তার ওপর সেই চ্যাটাইটা পাতা থাকে। কাঁথা-বালিসগুলোও একটু ফরসা ও ভদ্র হয়েছে আজকাল। তা ছাড়া আরও যে বিলাসের উপকরণ সংগ্রহ হয়েছে তা হচ্ছে শহর থেকে একটি ভাল আয়না আর চিরুণী। দেওয়ালেই টাঙানো থাকে। আর থাকে গান্ধীজীর ছবি দেওয়া একটা ক্যালেণ্ডার। সবাই ঠাট্টা করে ওর এই ঘর-কন্না সাজাবার দিকে মনোযোগ দেখে। সুরেন বলে, 'আহা ভাল, ভাল,—কেউ কোথাও নেই, চিরকাল কি আর এমনি নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবি—আর ভেসে ভেসে বেড়াবি! তাই কর্—বৌমাকে ঘরে আন্, নতুন করে ঘর-সংসার পাত্। মেয়ে একটি আছেও আমার হাতে ভাল। সত্যি! যে বয়সের যা, এখন একটু সংসারসুখ না হলে কি আর কাজ-কর্মে মন লাগে?'

এসব কথা কিন্তু রাজুর একদম ভাল লাগে না, সুরেনের অসভ্যতায় বিরক্ত হয় মনে মনে।···বিয়ে ক'রে এই জীবনেরই পুনরাবৃত্তি ক'রে যাওয়া অসম্ভব। এই সামান্য বিড়ির দোকানে বসে সামান্যতম পরিধির মধ্যে জীবন কাটানোর কল্পনাটা ওকে যেন পীড়াই দেয় মনে মনে। বৃহত্তর জীবনের কথা জানে না ও, তবে এটা জানে যে, যে জীবন ও কাটাচ্ছে সেটা বড়ই ছোট, বড়ই অকিঞ্চিৎকর! অথচ কী ক'রে এর থেকে মুক্তি পাবে—তাও বুঝতে পারে না।

যার কথা ও ভাবতে সাহস করে না ভাল ক'রে, অথচ যার চিন্তাই আসলে ওর মনের একটা অংশকে চিরকালের মত পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়েছে—সেদিনকার সেই নাম-না-জানা মেয়েটিকে আর একবার ও

দেখতে চায়—এটা সত্য কথা। কিন্তু, তার আগে চায় ও, এই তুচ্ছতা থেকে মুক্তি পেতে। কোনমতে তার উপযুক্ত না হোক্—তার সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা না নিয়ে সে দেখাও চায় না আর। এর মধ্যে অনেকবার ওর মনে হয়েছে, শহরে গিয়ে খোঁজখবর করলে হয়ত দেখা পাওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে। কলকাতা শহরের বিপুলত্ব সম্বন্ধে ওর কোন ধারণাই ছিল না। তাই এমন কথাও ওর ভাবতে বাধেনি যে শেষ পর্যন্ত কলকাতা শহরে গিয়েই যদি একটু ভাল ক'রে খোঁজে তাহ'লে ত নিশ্চয়ই দেখা পেতে পারবে! 'কংগ্রেস' কথাটা ওর কানে ছিল—কংগ্রেস অফিসে খোঁজ করলে স্বদেশীওলাদের দেখা পাওয়া যায়, এ আশ্বাসও তারিণীর কাছ থেকে সে পেয়েছে। কিন্তু তবু ওর ইচ্ছা হয়নি। যে দেখা ওদের হয়েছে সেই দেখা হওয়ার দিনটির দৈন্য—যার জন্য সেদিন ওর কিছুই মনে হয়নি, লজ্জাবোধ করবার কোন কারণ আছে তা বুঝতেও পারেনি—আজ মনে হ'লে ওর যেন মরে যেতে ইচ্ছে করে।...ও লেখাপড়া শেখেনি, ওর অর্থ নেই, ওর জীবনযাত্রা পরিচ্ছন্ন নয়—এই কথাগুলো আজকাল যেন ও নতুন ক'রে বুঝতে শিখছে। এই তথ্যগুলো মনে পড়ে আর লজ্জায় ঘৃণায় ছট্‌ফট্ ক'রে ওঠে, ভগবানকে জানায় বার বার যে, যেমন করে হোক্ তুমি এর থেকে মুক্তি দাও।

এইভাবেই দিন যায়। অবস্থার কোন উন্নতি হয় না, বরং আর্থিক অবস্থা কাজে গাফিলতির জন্য দিন দিন যেন খারাপই হয়। পরিচিতদের বকুনি খায়, অনুতপ্ত হয়—কিন্তু বকুনি খাবার কারণ আবারও ঘটে।

কিন্তু হঠাৎ জীবনের এই একটানা গতানুগতিকতার মধ্যে একটা নতুন কিসের আবির্ভাব হয়। সেই ক্ষুদ্র আরণ্য গ্রামেও সংবাদ এসে পৌঁছয় যে ভারতের দ্বারে যুদ্ধ এসে উপস্থিত হয়েছে, শত্রু এল ব'লে।

খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না, যুদ্ধের সঙ্গে এইটুকুই ছিল এতদিন সম্পর্ক। মধ্যে একবার বোমার হিড়িকে অনেক শহরের লোক এসেছিল গ্রামে, তারা আবার ফিরে গেছে—এখন আর কোন ভয় নেই, এমনিই একটা ভাসা-ভাসা খবর রাখত ওরা। কিন্তু এবারে আর একটু বেশি যেন ঘটেছে বলে মনে হ'ল। এই সংকট কালে দেশনেতারা স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, না পেলে তাঁরাও রাজার সঙ্গে অন্য রকম যুদ্ধ চালাবেন বলে নাকি ভয় দেখিয়েছিলেন। ফলে সহসা সমস্ত দেশনেতাদের কারারুদ্ধ করা হ'ল। প্রায় সব শহরে, এমন কি গ্রামেও, সে ধরপাকড়ের জের এসে পৌঁছল, আর তাইতেই দেশবাসী উঠল ক্ষুব্ধ হয়ে। নেতারা নেই, জনতাকে সংযত রাখতে পারে, অহিংসায় স্থির রাখতে পারে এমন লোক কেউ নেই—সুতরাং হিংসা ও বিশৃঙ্খলার একটা স্রোত বয়ে গেল দেশের ওপর দিয়ে।

রাজু এত কথা বোঝে না—শুধু চারদিকে দেখে একটা চাপা ষড়যন্ত্র, লোকের চোখেমুখে গোপন একটা উত্তেজনা। ওর কেমন ক'রে হঠাৎ মনে হয় যে এইবার সময় এসেছে। এই তুচ্ছতা, এই ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ বলে পরিচিত হবার এমন সুযোগ আর হয়ত পাওয়াই যাবে না। ও প্রস্তুত হয়, কিন্তু পথ দেখতে পায় না। যাদের স্বদেশীওলা লোক বলে জানত তারা এখন সবাই জেলে। এখন যারা বিদ্রোহের পথে নেমেছে, তাদের আভাস পায়, কিন্তু নাগাল পায় না। ও এগিয়ে গেলে তারা পিছিয়ে যায়—রাজু মূর্খ, রাজু বোকা—ও রকম লোক দিয়ে কাজ হয় না, সবাই এই কথা জানে—বরং এদের মত বোকারাই কাজ পণ্ড করে। তাই যাদের দলপতি মনে ক'রে রাজু নিজের কথাটা বলতে যায় তারাই ব্যাপারটা আগাগোড়া অস্বীকার করে। হেসে উড়িয়ে দেয়, নয়ত ওকে ধমক দেয়। ক্ষোভে লজ্জায়

রাজুর যেন মাথা কুটে মরতে ইচ্ছা করে। যে জীবনের এই মূল্য সেই জীবনটাকে অস্বীকার করাই যেন হয়ে ওঠে ওর একমাত্র কাম্য।

বোধ হয় বাসনাটা তীব্র থাকলে একদিন না একদিন মানুষ তা পূরণের পথ দেখতে পায়ই, রাজুরও তাই হ'ল। অতিকষ্টে কানা-ঘুষায় খবর যোগাড় করলে যে, কাল রাত বারোটার সময় একদল লোক যাবে সাত মাইল দূরের থানা লুঠ করতে। কলকাতা থেকেও নাকি আসছে কারা, তারাও সঙ্গে থাকবে।

রাজু মন স্থির করে। চোখ ওর জ্বলতে থাকে আশায়, এবার ওর মূল্য স্বীকার করাবেই, প্রাণ দিয়েও প্রমাণ ক'রে দেবে যে, সে কারুর চেয়ে খাটো নয়।

যে পথে বিদ্রোহীর দল যাবে রাজু তার সন্ধান পেয়েছিল আগেই। সেই পথে রাত্রির গোপন অন্ধকারে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ক্রমে একে একে তারই কাছে বনের মধ্যে এসে জড়ো হ'ল এক দুই ক'রে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। কারুর হাতেই বন্দুক নেই—আছে সাধারণ অস্ত্র, বল্লম, সড়কী, লাঠি। আঁধারে কারুর মুখ দেখা গেল না, কাউকে চেনা গেল না—তার প্রয়োজনও নেই। ওরা যে-ই হোক্, ওদের লক্ষ্য, ওদের ব্রতর সঙ্গে রাজুর লক্ষ্য মিলে গেছে—তাই যথেষ্ট।

যতটা সম্ভব চুপি চুপি ওরা এগিয়ে চলে। কখন্ রাজু এসে ওদের সঙ্গ নেয় তা তারা বুঝতেও পারে না। তখন কে কার হিসেব রাখে—টর্চ আছে কিন্তু আলো জ্বেলে সকলকে পরীক্ষা করার কথা মনেও আসে না কারুর।

বোধ হয় ওরা ভেবেছিল অতর্কিতে থানায় গিয়ে পৌঁছবে ওরা, অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে ঐ সামান্য অস্ত্রেই দখল করবে। কিন্তু কাছে

আসতেই বোঝা গেল পুলিশ আগেই খবর পেয়েছে—সজাগ সতর্ক আছে। গাছের আড়ালেই তখনও আছে ওরা—শুধু পাতা কি ছোট ডাল কেঁপেছে হয়ত কোথাও, সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল গুলি—গুড়ুম্‌!

এর জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউ, সবাই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। গুলি কারুর গায়ে লাগেনি এই যা। হয়ত শুধু সন্দেহ করেই গুলি ছুঁড়েছে—স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়ত সন্দেহটা কেটে যাবে, মনে করবে বাতাসে গাছ নড়ছে।

কিন্তু না—সন্দেহ নয়, ওরা খবর পেয়েছে। আবার গুলি ছুটল। এ যাত্রাও সবাই বেঁচে গেছে, জয় ভগবান, জয় মা কালী! ঐ একটা লোকের হাতেই বন্দুক আছে, ছোট থানা, একটার বেশি বন্দুক থাকার কথা নয়। কে যেন বলছে চুপি চুপি ফিস্‌ ফিস্‌ করে রাজুর পাশেই—'কোন মতে গিয়ে বন্দুকটা কেড়ে নিতে পারলেই কাজ হাঁসিল করা যায়। ঐ একটাই বন্দুক আছে, তারপর আমরা আর ওরা—মুখোমুখি।'

কণ্ঠস্বরটা খুবই মৃদু, বিকৃত না হ'লেও স্বাভাবিক থাকা সম্ভব নয়—তবু রাজুর মনে হয় যেন ওর পরিচিত। এ কণ্ঠ যেন কোন সুদূর অতীতে সে শুনেছিল, হয়ত আবার শোনবার আশাও রেখেছিল। কোনও মেয়েছেলের গলা—

অত ভাববার সময় ছিল না। রাজু ভাবলেও না—শুধু বার বার ওর কানে যেন কে বলতে লাগল—ওরে এই সুযোগ! অকস্মাৎ, কেউ কিছু বোঝবার আগেই ও গাছের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে পড়ল সামনের খোলা জায়গায়।

কিন্তু সামনের ফাঁকা মাঠটা অনেকখানি, এক লাফে, অতর্কিতে বন্দুকধারীর কাছে পৌছনো সম্ভব নয়, তা ছাড়া এসব ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার যে-সব কলাকৌশল আছে তাও রাজুর জানা ছিল না। বন্দুক আবার

গর্জে উঠ্‌ল—আগুন উঠ্‌ল ঝল্‌সে। রাজু ঠিক কিছু বুঝতে পারল না, শুধু মনে হ'ল ওর পাঁজরের মধ্যে কী একটা যেন জ্বলে উঠ্‌ল। তবুও থামেনি, ওর গতি শ্লথ হ'লেও এগিয়ে চলেছে ও, এমন সময়ে আবার! এবারে ওর কপাল!

কে যেন বনের মধ্য থেকে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—ফেরো ফেরো—ফিরে এসো!

রাজু ফিরল, কোনমতে আবার গাছের আড়ালে এসেই প'ড়ে গেল মাটিতে। আর শক্তি ছিল না ওর। পাশে যে ছিল সে টর্চ জ্বাল্‌ল একবার চকিতে। রক্তাক্ত ধুলোমাখা মুখ রাজুর—চিন্‌তে পারবার কথা নয়। উর্মিলাও চিন্‌তে পারলে না। সে চম্‌কে ব'লে উঠ্‌ল, 'বাই জোভ্‌—এ কে? এ ত আমাদের পার্টির কেউ নয়!'

কিন্তু সে প্রশ্ন মীমাংসার সময় তখন নেই। সিপাহীরা হৈ হৈ করে এগিয়ে আসছে, সেই বন্দুকধারী লোকটি সকলের পুরোভাগে। পালাও-পালাও! এ যাত্রা ব্যর্থ হয়েছে, এভাবে আর আসা চল্‌বে না। ···· পালাও!

সবাই দ্রুতগতিতে নিবিড় বনের মধ্যেকার সঙ্কীর্ণ পথ ধরে ছুটল। শুধু আর উঠতে পারলে না রাজু। তার পক্ষে আর কখনই ওঠা সম্ভব হবে না, কোনদিন নয়।

পশ্চিম দিগন্ত

তিনঘণ্টার বেশি রামলোচনের ঘুম হয় না। এগারোটা সাড়ে-এগারোটায় যখন সবাই শুয়ে পড়ে তখন অগত্যা তাঁকেও শুতে হয় কিন্তু ঠিক তিনটি ঘণ্টা পরে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। আগে আগে আরও কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করতেন, চোখ বুজে স্থির হয়ে পড়ে থাকতেন, কিন্তু আজকাল আর সে বৃথা চেষ্টা করেন না। হুঁকো-কল্কে ঠিক করাই থাকে, হাৎড়ে হাৎড়ে দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে টিকে ধরাবার লম্পটা জ্বালেন, তারপর কল্কেটা ধরিয়ে অন্ধকারেই বসে বসে নিঃশব্দে তামাক টানেন। অবশ্য যতটা সম্ভব নিঃশব্দে— হুঁকোর বেশি আওয়াজ হলে মেজকর্তা, মানে তাঁরই মেজভাই, বিষম বিরক্ত হন।

তামাক খাওয়া শেষ করে তাঁর খাটো গামছাখানি প'রে রামলোচন ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান। নিস্তব্ধ দালান, দালানের ওধারের দরজা খুললে তবে উঠোনে বা কলঘরে যাবার পথ। আলো জ্বেলেই যাওয়া উচিত—বুড়ো মানুষ, হোঁচট্ খাওয়া বা ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা ত পদে পদে—কিন্তু আলো জ্বালবারও হুকুম নেই। প্রথমত বেকার বড় ভাইয়ের জন্য বৃথা আলোর খরচ করতে মেজকর্তা বা ছোটকর্তা কেউ রাজী নন, তাছাড়া বাইরে আলো জ্বাললেও নাকি তাঁদের ঘুম ভেঙে যায়। সুতরাং দালানের জানালা দিয়ে এসে পড়া ক্ষীণ নক্ষত্রের আলোতেই দৃষ্টিটা সইয়ে নিয়ে সাবধানে এগোতে হয় একপা একপা করে, দেওয়াল ধরে ধরে। অবশ্য পথটা এতদিনের অভ্যাসে একরকম জানা হয়েই গেছে—কোথায় আলমারির কোণ হাতে ঠেকবে, তারপর কোথায় বাসনের সিন্দুক, তাঁর আঙলগুলো আন্দাজে আন্দাজে ঠিক

খুঁজে নেয়। একটা টর্চ আছে বটে কিন্তু তার ব্যাটারি দেয় ভাগ্নে বাদল,—সে ব্যাটারি মাস-দুই চ'লে এক সময়ে নিঃশেষ হয়। কিন্তু বাদল ত আসে এ বাড়িতে ছ-মাস আট-মাস অন্তর, বাকি সময়টা যে-তিমিরে সে-তিমিরে।

কলঘর থেকে ফিরে আস্তে আস্তে দালানের দরজা বন্ধ করে দিয়ে রামলোচন থমকে দাঁড়ান। বাইরের চেয়ে ভেতরে অন্ধকার একটু বেশি গাঢ়, সুতরাং কিছুক্ষণ ধরে দৃষ্টি সইয়ে নিতে হয়। তারপর চলে তাঁর চৌর্যবৃত্তির নিঃশব্দ অভিযান। কোথায় আনাজের ঝুড়িতে মেজবৌ ভুলে কলা ফেলে গেছেন হয়ত; কিংবা মিটসেফের মাথায় কোন বৌমা তাঁর ছেলেদের বিস্কুটের বাক্স রেখে দিয়েছিলেন, তাড়াতাড়িতে ঘরে নিয়ে যেতে বা আলমারিতে তুলতে ভুলে গেছেন; কোথাও বা তারের ঝুড়ি ঝুলোনো আছে কড়িকাঠ থেকে—তার মধ্যে আছে মেজবৌমার মেয়ের তাল-মিছরি কি ন'বৌমার মেজছেলের গুঁজিয়া; এইগুলি ঘুরে ঘুরে হাত দিয়ে দিয়ে অনুভব করেন রামলোচন, টিপে টিপে পরিমাণটা বুঝে নেন, বিস্কুট হ'লে অন্ধকারেই গুনে দেখেন। চুরি করতে করতে তার 'আর্ট'-টা ওঁর জানা হয়ে গেছে; এমন-ভাবে নিতে হবে যে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। বিস্কুটের বাক্স যদি একেবারে ভর্তি থাকে তাহ'লে একখানার বেশি নেওয়া চলবে না, আবার খুব খালি হয়ে এলেও তাই। অথচ মাঝামাঝি অবস্থায় দুখানা কি তিনখানাও তুলে নেওয়া যায়, কারণ সে সময়টা অত হিসেব থাকে না। মিছরি কিংবা গুঁজিয়া যদি ঠোঙাভর্তি থাকে ত দুটো তিনটে পর্যন্ত সরিয়ে ফেলেন, নইলে লোভ সংবরণ করতে হয়, একটা বা একটুক্‌রো নিয়েই ক্ষান্ত হন।

এইভাবে এদিক ওদিক হাৎড়ে লুণ্ঠিত জিনিসগুলি বুকে করে নিজের ঘরে ফিরে আসেন। সেগুলি বিছানার ওপর সযত্নে সাজিয়ে রাখা

হ'লে তবে কাপড় ছাড়বার কথা মনে পড়ে। এই বস্তুগুলি তারপর অন্ধকারে বসে বসেই খাওয়া চলে, সেই শেষরাত্রেই। মিছরিটা চিবোতে পারেন না, গালে ফেলে পাকুলে পাকুলে খান। খাওয়া শেষ হ'লে আর এক কলকে তামাক টেনে আর একবার গিয়ে শুয়ে পড়েন, নিশ্চিন্ত হয়ে।

কিন্তু বোধ হয় ঠিক নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে পারেন না, কারণ কান থাকে মেজকর্তার ঘরের দোরের দিকে। মেজকর্তা ওঠেন ঠিক সাড়ে চারটায়, তাঁর ছিটকিনি খোলার শব্দ পেলেই রামলোচনও সরকারী ভাবে শয্যাত্যাগ করেন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম আওড়াতে আওড়াতে গিয়ে তামাক সাজতে বসেন। শীতকালে তখনও অন্ধকার থাকে, কিন্তু তাতেই বা কি, এখন আর আলো জ্বালতে বাধা নেই। মেজকর্তা নিজে যে সময় ওঠেন, তাঁর বিশ্বাস সেইটেই ঘুম ভাঙবার প্রকৃষ্ট সময়, সুতরাং তখন আলো জ্বাললে বা কথা কইলে বিরক্ত হন না। তামাক খাওয়া শেষ করে আর একবার তাঁর খাটো গামছাখানির শরণাপন্ন হতে হয়। এবারে দালানে আলো জ্বালানোই থাকে, কারণ মেজকর্তা উঠেই কলঘরে ছোটেন, দৈবাৎ তা না থাকলে রামলোচন সদর্পে আলো জ্বালতে জ্বালতে এগিয়ে যান। আর ভয় কাকে!

এর পর প্রাতঃকৃত্য শেষ করে পূজা-আহ্নিক সারতে সারতে বেলা ফরসা হয়ে যায়, গরমের দিনে রোদ উঠে পড়ে কটকটে। কিন্তু তখনও এক বড় বৌ অর্থাৎ রামলোচনের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মেয়ে-ছেলে ওঠে না—তাদের ছেলেরা ত নয়ই। মেজকর্তা ছোটকর্তা উঠেও নিজেদের পরলোক-চর্চায় ব্যস্ত থাকেন বলে তরুণ-তরুণীদের নিদ্রাভঙ্গের কোন কারণই ঘটে না। তা না হোক, রামলোচন তাতে দুঃখিত নন্। সবাই উঠে পড়লে ঝামেলা, ছেলেমেয়েরা চ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু করে দেয়,

স্ত্রীলোক ও পুরুষে দালান-উঠোন যেন গিজ গিজ করতে থাকে। সে ভিড় অসহ্য মনে হয় তাঁর। তার চেয়ে এই ভাল। বড়-বৌ স্নান করতে যান রান্নাঘরের চাবি খুলে দিয়ে, রামলোচন সেখানে ঢোকেন স্ত্রীকে সাহায্য করতে। প্রত্যহ উনান ধরিয়ে দেওয়া তাঁর কাজ, এটা তিনি স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন। বাড়ির আর কোন কাজ তাঁকে দিয়ে কেউ করাতে পারে না, এইটি ছাড়া। তার কারণ, আর কেউ ওঠবার আগে একা রান্নাঘরে ঢোকা লাভজনক। গত রাত্রির অবশিষ্ট বহু ভোজ্য নানা রকমে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে, হিসাবের সম্ভাবনা বাঁচিয়ে এ ঘরে নিয়ে আসা বা ওখানেই উদরস্থ করা এমন কিছু কঠিন নয়। অবশ্য দু-একবার যে ধরা পড়বার উপক্রম না হয়েছে এমন নয় কিন্তু প্রতিবারই কোনমতে সেটা এড়িয়ে গেছেন।

এরপর জামাটি গায়ে দিয়ে লাঠি হাতে প্রাতর্ভ্রমণে বার হন। এ নাকি তাঁর ডাক্তারের উপদেশ, খুব ঝড়-জল না হ'লে ভ্রমণ বন্ধ থাকে না। কিন্তু লোকে অবাক্ হয় এই দেখে যে একেবারে লেকের গায়ে বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেদিকে বেড়াতে যান না। তিনি যান ওধারের রাজপথ ধরে—সোজা গিয়ে বড় রাস্তায় ওঠেন। এইবার উদ্দেশ্যটা বোঝা যায়, ওখানকার দোকান থেকে এক আনার জিলিপি বা সিঙাড়া কিনে বাড়ি ফেরেন। এটা হ'ল প্রকাশ্য জলখাবার। বাড়ির চায়ের পর্ব শুরু হয় একটু বেলাতেই—চাকরি ত কেউ করে না, সকলেই ব্যবসায়ী। অত বেলা অবধি থাকৃতে পারেন না বলে বেড়িয়ে এসেই জিলিপি-দুটি খেয়ে একঘটি জল খান প্রকাশ্যে। আগে আগে ভাইপো ভাইঝিদের ছেলেমেয়েরা লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকৃত। এখন তারাও মানুষ চিনে নিয়েছে, বৃথা লোভ করে না।

চায়ের পাট শুরু হয় সাড়ে-সাতটা নাগাদ। তখন বিস্কুট বা টোস্ট

যাহোক কিছু অদৃষ্টে জোটে, নইলে হয়ত গরম পরোটা। কিন্তু তাতেও অনেকদিন তাঁর হয় না, রান্নাঘরের দোরের কাছে মোড়া পেতে বসে এদিক ওদিক চেয়ে প্রশ্ন করেন, 'বড় বৌ, বাসি রুটি এক-আধখানা পড়ে আছে নাকি ?' বড় বৌ বিষম চটে যান, গালমন্দও হয়ত দেন, তবু না দিয়েও থাকতে পারেন না। প্রার্থিত বস্তু হাতে পেলে প্রশান্ত মুখে গালাগাল শুনতে রামলোচনের আপত্তি নেই।

এসবের পালা শেষ করে আর একবার বাইরে বেরোন। রোগ একরকমের নয়; অর্শের জন্য ওল বা কচু চাই; পেটের অসুখের জন্য গাঁদাল পাতা বা থানকুঁড়ি পাতা; ডুমুর, কচুশাক, ওলকোঁড়া, নিমপাতা —এর জন্য ঢাকুরিয়া অঞ্চলে গিয়ে বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয় এই সময়টা। গড়পা বা বৈষ্ণবঘাটা পর্যন্ত এক-একদিন হেঁটে যান যদি বিনামূল্যে পলতা পাওয়া যায় এই আশায়,—ধনে-পলতা খেতে হবে, রক্ত পরিষ্কার করে। এরই মধ্যে অবশিষ্ট তিনটি দাঁতের গোড়ার পরিচর্যার জন্য বকুলছাল বা নিমছাল কি পেয়ারা পাতা সংগ্রহ করতে ভুল হয় না। এইসব বোঝা সংগ্রহ করে দশটা এগারোটার সময় বাড়ি ফিরে বড়বৌর অবসরের জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারের জন্য সাধারণ রান্না যা হচ্ছে তার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর এইসব রান্না করিয়ে নিতে হবে। —বড়বৌ রাগ করেন খুবই, কিন্তু না করলেও নয়, বৃদ্ধ স্বামী হাতে-পায়ে ধরাধরি করেন। বাড়ির ঝালমশলা-তেল-বিশিষ্ট সমস্ত ব্যঞ্জন-গুলির হিসাব কিন্তু সংগ্রহ করা থাকে রামলোচনের, খাওয়ার সময় নিজের নানা রকমের পথ্যের সঙ্গে সেগুলোও মিলিয়ে বুঝে নেন। ওঁর বিশ্বাস এই উপকারী বস্তুগুলোর সঙ্গে ওসব জিনিস খেলে আর দোষ নেই, ওর বিষক্রিয়া এতে কেটে যাবে। আবার এরই এক ফাঁকে দই আনতে ভুল হয় না চার পয়সার। সামান্য যা টাকা নিজের হাতে

আছে এবং ভাইপো ও ভাগ্নেদের কাছে চেয়ে-চিন্‌তে যা পান, তাইতেই এই সব চলে। তাই বলে তাঁর এই সব খাদ্য থেকে কণামাত্র কাউকে তিনি দেন না, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একফোঁটা দই কি একটুক্‌রো কলার জন্য কেঁদে মরে গেলেও না। উদাসীন নিস্পৃহতার সঙ্গে সে সব তিনি উপেক্ষা করতে পারেন।

দ্বিপ্রহরের এই গুরুভোজনের পরে একটু দিবানিদ্রা দিয়ে উঠেই শুরু হয় চায়ের জন্য ধন্না দেওয়া। দুপুরের আগুনের যা জের থাকে উনুনে, তাইতেই জল গরম করে নিয়ে তিনটে নাগাদ দুতিন কাপ চা তৈরী হয় মেজগিন্নী ও কোন কোন বধূর জন্য। তা থেকে ভাগ নেওয়া চাই-ই তাঁর। তারপর তামাক ও অপরাহ্ণকৃত্যের পর আবার পাঁচটায় যখন সরকারী চা-জলখাবারের ব্যবস্থা হয় তখন সেটা'রও পুরোপুরি সুবিধা নিতে ইতস্তত করেন না।

এর পরের ইতিহাস আরও বিচিত্র। এই সময় তিনি সত্যি সত্যিই বেড়াতে বেরোন। গলাবন্ধ কোটটির ওপর মান্ধাতার আমলের চাদর ঝুলিয়ে ছড়িটি নিয়ে বেরোন। এ অভ্যাস তাঁর নাকি বহুকালের। প্রথম বয়সে যখন কিছু পৈতৃক অর্থ ছিল হাতে, যখন এই সময় চোখ দুটো রঙীন করবার ব্যবস্থা ছিল, তখন নাকি যেতেন মেয়েমানুষের কাছে। অবশ্য বড় নজরের সঙ্গতি বা ইচ্ছা কিছুই ছিল না, খোলার ঘরের সস্তা স্ত্রীলোকের কাছেই যাতায়াত ছিল। এখন সে সামর্থ্যও নেই (বহুকাল ধরেই নেই), সুতরাং সখটা অন্যভাবে মেটাতে হয়। বড়রাস্তাটা যেখানে বেঁকে কলকাতার সীমা লঙ্ঘন করেছে সেখানে এবং আশেপাশে বিস্তর বস্তি আছে। সাধারণত ঝিরা ঐ সব বস্তিতেই ঘরভাড়া করে থাকে। সেখানে কিংবা ওধারের পাড়ার মধ্যে, রাস্তার

কলের ধারে কি পুকুর-পাড়ে যেখানে তারা কাজ-কর্ম করে, রামলোচন ঘুর ঘুর করেন সেইখানেই। বকুল ঝি বলে—'ঠাকুর যেন ছোঁক্ ছোঁক্ করে বেড়ান।' অবশ্য এরা অধিকাংশই খারাপ নয়, স্বামী-পুত্র নিয়ে বাস করে; কিন্তু খারাপ হ'লেই বা কি, রামলোচনেরও সে বয়স নেই। শুধু মেয়েছেলের সাহচর্য লাভ করা, তার সঙ্গে দু'টো আলাপ করা——এইটুকু তাঁর সাধ, এতেই তিনি কৃতার্থ। চিরকালই অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গ তাঁর ভাল লাগে কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েদের সংস্পর্শে কেমন অস্বস্তি বোধ করেন। সুতরাং ঝোঁকটা ওঁর এদের দিকেই বরাবর।

বিচিত্র মানুষ রামলোচন!

পৈতৃক জমিজমা এবং সামান্য কিছু টাকা-কড়ি ছিল বৈকি! কাজ-কর্ম কোনদিনই করেননি, বসে খেয়েছেন এবং নাবালক ভাইদের অংশও বেচে উড়িয়ে দিয়েছেন। লেখাপড়া জানতেন না, চাকরি করার যোগ্যতা বা ব্যবসা করার মত বুদ্ধিও ছিল না। বরং শেষ বয়সে দোকানে খাতা লেখার কাজ বা ছোট ছোট ছেলে-পড়ানোর কাজ যোগাড় করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু খাতায় ভুল করার জন্য এবং ছেলেমেয়েদের ভুল শেখানোর জন্য কোন চাকরিই টেঁকেনি বেশি দিন। অবশ্য খুব বেশি প্রয়োজনও ছিল না আর—ভাই ও ভাইপোরা ভাল, কেউ ওঁকে ভাসিয়ে দেয়নি। যদিচ, অনেকে বলে সেটা ওঁর জন্য নয়, বড়বৌ-এর জন্য। বড়বৌ সুগৃহিণী, সংসারটাকে মাথায় করে আছেন, তাঁর মুখ চেয়েই তাঁর স্বামীকে সহ্য করে ওরা। আর বড় বৌ-ও স্বামীর সামর্থ্য জানেন বলে প্রাণপণে খেটে যান। পরের বাড়ি রাঁধুনীগিরি করার চেয়ে নিজের দেওর ও দেওরপোদের সংসারে খাটা ভাল—এই তাঁর বিশ্বাস। বাইরে অন্তত সম্মানটা থাকে তাতে।

ভাইরা বড় হয়ে সবাই ব্যবসা ক'রে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিলেন, সে সব ব্যবসা ভাইপোদের হাতে পড়ে আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আসবাবের দোকান, মনোহারী, ছাপাখানা, বইয়ের দোকান—কী নেই! অভাব নেই কোথাও, তাই বড়ভাইকে সহ্য করেন। তাছাড়া মানুষটা ত নিজেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, আর ক-দিন! পেট খারাপ, কিছুই হজম হয় না, ছত্রিশ রকমের রোগ ও উপসর্গ দেহে জড়ানো। ডাক্তার বলে এসময় ওঁর একবেলা অল্পকিছু আহার করা উচিত, তাতেই সুস্থ থাকবেন। কিন্তু সে সব কথা উনি বিশ্বাস করেন না। শরীর যত খারাপ হয় তত খেতে চান। আহারের লোভ ত বটেই—তাছাড়া ধারণা আছে যে, যত বেশি খাবেন তত শরীর সারবে। এই করেই হজমের ক্ষমতা নষ্ট করেছেন উনি, বেশি করে খেয়ে উঠেই এমন কিছু খেতে শুরু করেছেন—হজমী বলে যার খ্যাতি আছে; আবার হজমী জিনিস খাচ্ছেন যখন, তখন শীগগিরই হজম হয়ে যাবে এই বিশ্বাসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারী খাবার খেয়েছেন।

তবু, এসবও অনায়াসে ক্ষমা করা যেত যদি স্বভাবের ঐ বড় দোষটা না থাকত।

স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর বনিবনাও কোন কালে নেই, দুজনের ঘনিষ্ঠতা দেখেছে বলে কারুর মনে পড়ে না। এমন কি ওঁদের যে সন্তান হয়নি তার জন্য বড় বৌ আকারে ইঙ্গিতে স্বামীকেই দায়ী করেন। অথচ বাইরের টান ওঁর আছে প্রথম থেকে—আজ পর্যন্ত। বাড়িতে তরুণী ঝি রাখার উপায় ছিল না, তার জন্য অন্যান্য বধূদের বহু বাঁকা কথা শুনতে হয়েছে বড় বৌকেই। তাতেও রক্ষা ছিল না, ঘরে না পেলে পাড়ার আশে-পাশে খুঁজে বেড়িয়েছেন।

আজ, এই এতকাল পরে, নখদন্তহীন অবস্থাতেই বা কম কি?

বিকেলে যখন বেড়াতে বেরোন তখন পাড়ার যতগুলি ঝির সঙ্গে দেখা হয় প্রত্যেকের সঙ্গেই খানিকটা ঘনিষ্ঠতা না করে ছাড়েন না—অথচ কেউ কোনদিন শোনেনি তাঁকে ভাই-পো ভাই-ঝির বা নাতি-নাত্‌নীদের খবর নিতে। আর বাইরে?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথম মোড়টিতেই হয়তো থেমে গেলেন রামলোচন, 'বলি অ লক্ষ্মী, ভাল আছ? মেয়ে ভাল? শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরেছে মেয়ে? ওর শাশুড়ী কেমন?...ভাল...ভাল।'

লক্ষ্মী হয়ত প্রশ্ন করে, 'আপনার শরীর কেমন দাদাঠাকুর?'

'আমার আর শরীর! খেতেই পাইনে ভাল, শরীর সারবে কি করে? যা বাজার, না দুধ না দই—কী খেয়ে বাঁচি তারই নেই ঠিক।...যাবো একদিন লক্ষ্মী তোদের বাড়ি, মেয়ের কী গয়না হ'ল দেখে আসব।'

ততক্ষণে হয়ত অন্নদা এসে পড়ল।

'এই যে অন্ন, কবে এলি? শরীর ভাল? ইস্—আবার নতুন ফুল গড়ালি যে কানের—ও কী ফুল রে?'

'পেজাপতি বাবাঠাকুর, পাখায় লাল পাথর বসানো। তাই ছত্রিশ টাকা পড়ল। কী সোনার দর হয়েছে!'

'ছ-ত্রি-শ টাকা! তা হবে বৈকি! প্রায় যে একশ' টাকা দর এখন সোনার। বেশ, বেশ, দিব্যি মানিয়েছে কিন্তু তোকে অন্ন। নতুন রসান দেওয়া ফুল, মুখখানি বেশ জম্‌জম্ করছে!'

অন্ন মানুষ চেনে। সে বাসন নামিয়ে হাত ধুয়ে নিয়ে বলে, 'এই গড়াতে গিয়ে হাত একেবারে খালি হয়ে গেল বাবা...দোক্তা কিনব এমন পয়সা হাতে নেই, কী টানাটানি চলছে কি বলব!'

রামলোচন পকেটে হাত পুরে একটা আনি বার করেন, 'তাইত, অন্ন, এই আনিটা রাখ্। দোক্তা কিনে নিয়ে যাস্।'...তারপর একটু

ইতস্তত ক'রে বলেন, 'আর বুঝলি, দরকার হ'লে চাস্, লজ্জা করিসনি!'

আজই সকালে ছোট ভাইপোর কাছ থেকে তিনটে টাকা পেয়েছেন, পকেট ভারী আছে।

ওখান থেকে এগিয়ে গিয়ে একটা পুকুরের ধারে থম্‌কে দাঁড়ান। এই বাড়িতে বীণা কাজ করে। তাঁদেরই পুরোনো ঝি কাদুর মেয়ে বীণা, অল্পবয়সী, সুশ্রী মেয়েটি। শ্যামবর্ণের ওপর দিব্যি শ্রী, মুখে হাসি লেগেই থাকে বলে আরও ভাল দেখায়। বীণা এবাড়ি আসে ঠিক সাড়ে পাঁচটা ছটার সময়ে, সময়টা জানা আছে রামলোচনের। এখনই বাসন নিয়ে বেরিয়ে ঘাটে আস্‌বে মাজ্‌তে।

বীণা এসে ঘাটে বাসন নামালে রামলোচন একেবারে কাছে এসে উবু হয়ে বসেন। টেনে টেনে রস দিয়ে বলেন, 'কী লো, আজ মুখ ভারি ভারি কেন? বর বুঝি আসেনি কদিন?'

'কী যে বলেন দাদু,' বীণা মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'মুখের আক্‌ঢাক্ নেই! আজ একটু অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই!'

লোলচর্ম, ঈষৎ-কম্পিত হাতখানা বাড়িয়ে দেন রামলোচন ওর দিকে, বীণার মসৃণ নিটোল বাহুমূলে হাত বুলিয়ে যেন ওর উন্নত যৌবনটা অনুভব করতে করতে বলেন, 'যাই বল্ বীণা, এমন হাত, একজোড়া তাগা না হ'লে মানায় না। বরকে বলতে পারিস না গড়িয়ে দিতে?'

একটা ঝাঁকানি দিয়ে বীণা হাতটা সরিয়ে নেয়, 'আমার বর ত আর বড়লোক নয়। কী যখন তখন গায়ে হাত দাও দাদু, লজ্জা করে না? আমরা না হয় খেটে খাই লোকের বাড়ি, তোমারও ত মান মর্যোদা আছে!'

অপ্রতিভ রামলোচন ফোক্‌লা দাঁত বার করে হাসেন বোকার মত,

'তাতে কি হয়েছে রে, হাজার হোক তুই ত নাতনী হলি লো সুবাদে !'

'তা হোক্, তুমি যাও—ওঠো এখন। কাজ করতে দাও।'

অগত্যা উঠতে হয় ওঁকে। সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে অঘোর ঘরামীর দাওয়া ; রামলোচন ধপাস্ করে সেখানে বসে পড়েন। অঘোরের মেয়ে সুকুমারীকে ডেকে বলেন, 'এক ছিলিম তামাক খাওয়াবি নাকি রে নাতনী ? ছাখ্, খাওয়াস ত বসি নইলে চলে যাই।'

এমনি করে দু-তিনটে পাড়া ঘুরে সকলকার খবর নিয়ে বাড়ি ফেরেন যখন, তখন আটটা বেজে যায়। এসেই রান্নাঘরের সামনে আবার ধন্না শুরু হয়—গরম রুটি, দাল আর সামান্য একটু দুধ মিলবে, সেই আশায়।

এই হ'ল তাঁর দৈনন্দিন জীবন। জীবনের যত সমস্যাই দেখা দিক চারিদিকে, যত প্রশ্নই তীব্র হয়ে উঠুক, ওঁর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, প্রতিটি দিন এবং রাত্রি, অপর দিন ও রাত্রির সঙ্গে সমান। কোথাও কোন তফাৎ, কোন বৈচিত্র্য নেই।

আষাঢ়ের শেষাশেষি রামলোচন এবার বিষম রকম পড়লেন। জ্বর, তার সঙ্গে উদরাময়, ডাক্তাররা বললে খারাপ ধরণের অসুখ, বোধহয় গ্রহণী। তিনচার দিন পরেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বড়বৌ সেবা করতে এসে দেখেন তোষকের নিচে কতদিনের বাসি পচা জিলাপি, ভাঙা বিস্কুট, শুক্‌নো লুচি। কবে কোন্ দোকানের হালখাতায় একসরা খাবার পেয়েছিলেন, কাউকে কখনও কোন খাবারেরই ভাগ দিতেন না, তবু কোন্ চক্ষুলজ্জায় লুকিয়ে এনে সরাসুদ্ধ ট্রাঙ্কের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। সেগুলো পচে সমস্ত বাক্সটায় দুর্গন্ধ। বড় বৌ এসব সাফ করেন, গজগজ করেন আর গালাগাল দেন। তবু করতে হয় তাঁকেই ; নইলে এত কে করবে আর ?

প্রায় মাসখানেক ভুগে জ্বরটা গেল, পেটটাও সামান্য একটু ধরে এল, রামলোচন সজ্ঞানে আবার ভাল করে তাকালেন চারিদিকে। কিন্তু পা আর হ'ল না। উঠতে কিছুতেই পারেন না, পায়ে জোর নেই, কোমরও বোধ হয় ভেঙেছে। রামলোচনের বিলাপের শেষ নেই। কেউ তাঁকে ভাল করে ডাক্তার দেখাচ্ছে না—এ অনুযোগ ত আছেই। বড়বৌকে চুপি চুপি বলেন, 'আছি, তবু ত মাছ-ভাত পেটে যাচ্ছে দুবেলা বড়বৌ, তুমি একটু মুখ পানে চাও। ওরা না দেখায়, বালাজোড়া বাঁধা দিয়ে ভাল ডাক্তার আনো!'

বড়বৌ উত্তর দেন, 'মরণ আর কি! কী এমন নিধি উনি তাই বালা বাঁধা দিয়ে ডাক্তার দেখাতে হবে! কেন, ভাইরা ডাক্তার দেখাচ্ছে না? উপযুক্ত ছেলে থাকলেও এমন চিকিচ্ছে হত না, ভাই-ভাইপো যা করলে। আর বুড়োবয়সে কি একদিনে সেরে ওঠে নাকি?"

একটু চুপ করে থেকে কাতর-কণ্ঠে বলেন, 'বড়বৌ, হাত পায়ের ফুলোগুলো কমে গেলে বোধ হয় একটু জোর পাবো, তোমার বাপের বাড়ির দেশে কী এক সুতো পাওয়া যায় না? ধারণ করলে ফুলো কমে?'

বড়বৌ বললে, 'হ্যাঁ, ডাক্তাররা বলছে পেটে কিছু হজম হচ্ছে না, তার দরুণ রক্ত নেই বলে হাত-পা ফুলছে—লালসুতো বেঁধে উনি সে ফুলো সারাবেন!'

তবু লালসুতো এনে দু পায়ে বেঁধে দেন। আরও দুএকটা মাদুলী আসে। কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না, পায়ে আর জোর আসে না কিছুতেই।

সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে রামলোচনের এই পরনির্ভরতা। বিছানায় শুয়ে দৈহিক কাজগুলো সারতে হয় এজন্য তাঁর তত দুঃখ নেই, কারণ সে বড় বৌ করে—এখনও তাঁকে তিনবার করে কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল

নিতে হয় মাথায় (এতবার স্নান করা সম্ভব নয় বলেই এই ব্যবস্থা), সে জন্য লজ্জাও নেই—কিন্তু আহারটার জন্যেও যে পরের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হয়, এর চেয়ে আর দুঃখ কি আছে ? ডাক্তার বেঁধে দিয়েছেন পোরের ভাত, সিঙ্গিমাছের ঝোল আর কাঁচকলা সিদ্ধ, বিকালে বার্লি, রাত্রে দুধবার্লি বা খই-দুধ। এ খেয়ে কি মানুষ বাঁচতে পারে, না পায়ে জোর পায় ? এ শুধু ওদের ষড়যন্ত্র ওঁকে পঙ্গু ক'রে রাখার।

রামলোচন হাঁ করে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন। একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন বাইরের দালানের দিকে। কিন্তু দালানের একোণের দিকে প্রায়ই কারুর প্রয়োজন হয় না—কদাচিৎ কেউ ছিটকে এসে পড়ে। তবে যদি কেউ আসে তার আর রক্ষা নেই, সঙ্গে সঙ্গে রামলোচনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তাকে তাড়া করে, 'অ নবৌমা, মালক্ষ্মী, এদিকে একবার শোন-না। আমার মা-জননী কই গো, ছেলেকে কি মনে পড়ে না ?'

আগে আগে দয়া-পরবশ হয়ে কিংবা ভদ্রতার খাতিরে, ইদানীং মজা দেখবার জন্য হয়ত সে এসে দাঁড়াল। ভাল করে ঠাউরে দেখে রামলোচন বললেন, 'ন-বৌমা নয়—আমাদের নতুন বৌমা, মালতী ? বেশ, বেশ—আহা, তুমি মা কত বড় বংশের মেয়ে, তোমার বাবাকে ত আমি চিনি—মহাশয় লোক ছিলেন! আহা অমন লোক কি আর হবে!'

মালতী হয়ত বললে, 'ওকি জ্যাঠামশাই, ছিলেন কি, আমার বাবা ত এখনও বেঁচে আছেন!'

'থাকবেন বৈকি মা, থাকবেন বৈকি! পুণ্যের শরীর তাঁর, দীর্ঘজীবী হয়ে থাকবেন। তুমি দেখে নিও নতুন বৌমা, একশ বছর পরমায়ু পাবেন তোমার বাবা!...তা হ্যাঁ বৌমা, একটা কথা শুনবে মা ?'

'কী বলুন ?' অতিকষ্টে হাসি চেপে বললে মালতী।

'চারটি মুড়ী একটু নুন-তেল মেখে নিয়ে আসতে পারো মা ? খুব ছুটিখানি ?'

'না জ্যাঠামশাই, সে আমি পারব না। ডাক্তার আপনাকে তেল খেতে একেবারে বারণ করেছে !'

'ওসব ডাক্তারদের বুজরুকি মা, বুঝেছ ? আমাকে মেরে ফেলবার মতলব। ওসব তুমি শুনো না বাছা,—যাও ছুটিখানি মেখে নিয়ে এসো, লক্ষ্মী মা আমার !'

মালতী ঘাড় নেড়ে বললে, 'সে আমি পারব না। মা জ্যাঠাইমা রাগ করবেন।'

এই বলে সে হয়ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রামলোচন রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বললেন, 'তা পারবেন কেন ? কুঁড়ে পাথর, নিজে গিলতে পারো খুব ! রাক্ষুসী !···ছোটলোকের ঘরের মেয়ে ত, ও আর কত ভাল হবে ! ছোটলোকের ঝাড় সব !' ইত্যাদি।

সে রাগটা কমলে আবার উৎসুক দৃষ্টি মেলে শুয়ে থাকেন। এবার হয়ত আসে চাঁপা, মেজভাইয়ের নাৎনী। সঙ্গে সঙ্গে রামলোচনের কণ্ঠ মোলায়েম হয়ে আসে, 'চাঁপা ভাই, দিদি আমার, একবার শুনবি এধারে ? একটুখানি, এক মিনিট ?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাঁপা এসে দাঁড়ায়, 'কী বলছ ?' সতেরো আঠারো বছরের ঝলমলে মেয়ে চাঁপা, সদ্য বিয়ে হয়েছে ওর, শাড়িতে ও গয়নায় যেন জ্বলছে।

'চাঁপা ভাই, নাতজামাই এসেছিল কাল ?'

'কাল কেন আসবে, কাল কি আসবার দিন ? কী দরকার তাই বলো না—'

'না তাই বলছি ! যাই বলিস ভাই চাঁপা, আমার সলিল বড় ভাল ছেলে, অমন জামাই একটাও এবাড়িতে আসেনি ! যেমন রূপ তেম্‌নি গুণ ! আর বিদ্যেটাই কি সোজা ? সলিল আমার রত্ন ।'

'আচ্ছা তাই না হয় হ'ল । এখন আমাকে ডাকছিলে কেন ?'

'চাঁপা, একখানা গরম লুচি খাওয়াতে পারিস দিদি ?'

'লুচি ? লুচি কোথা পাবো ?'

'তবে একটা গজা ?' উৎসাহে, আগ্রহে, আকুলতায় মাথাটা ওঁর বিছানা থেকে ঝুলে পড়ে, 'একখানা খাস্তার গজা ? গজা খেলে কিচ্ছু ক্ষতি হবে না আমার, তুই দেখে নিস !'

'হ্যাঁ, তারপর বড়দি আমাকে বকুক ! তাকে একশ' বার ময়লা ঘেঁটে মরতে হচ্ছে, আর আমি কুপথ্যি খাইয়ে আরও রোগ বাড়িয়ে দিই ! সে আমি পারব না ।'

সবেগে মাথা নেড়ে, শাড়ির আঁচল দুলিয়ে চাঁপা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে ।

রামলোচন পেছন থেকে গালাগালি দেন, 'মরণ ! অহঙ্কারে মট্‌মট করছেন । তবু যদি বড়লোকের ঘরে বিয়ে হ'ত ! ঐ ত বরের ছিরি, কালো রোগা ব্রেষ কাঠ ! ঐতেই এত তেজ ! তেজের মাথা খাও !'...

আবারও গলাটা ঝুঁকিয়ে দালানের দিকে চেয়ে থাকেন, যদি কেউ আসে এধারে ।

সেদিন বাড়িতে কী একটা খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, বোধ হয় কোন বৌয়ের সাধ কিংবা অন্নপ্রাশন কারুর ছেলের । সারাদিন ভাল ভাল রান্নার গন্ধ রামলোচনের নাকে এসে পৌঁচেছে অত দূর থেকেও । সন্ধ্যা থেকে লুচি, কাটলেট, পাঁপর ভাজার গন্ধ । অনেকবার মিনতি

করেছেন বড়-বৌয়ের কাছে, অনেক পরলোকের ভয় দেখিয়েছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। সন্ধ্যাবেলা রাগ করে দুধবার্লির গ্লাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, তাতে লাভের মধ্যে বড়বৌয়ের কুবাক্যই সইতে হয়েছে, পরে আর একগ্লাস বার্লিও জোটেনি। অতিথিদের শুনিয়ে গৃহস্থদের অপদস্থ করার ইচ্ছায় খানিকটা চীৎকার করে কাঁদবার চেষ্টাও করেছেন—ফল হয়েছে এই যে, ছোট ভাইপো এসে ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে গেছে। অগত্যা ঘরে শুয়ে শুয়ে অতিথিদের আনন্দ-কোলাহল শোনা এবং পরিবেষণের শব্দ থেকে কি কি রান্না হয়েছে সেটা অনুমান করার চেষ্টা করা—এছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি রামলোচন।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এল। বাড়ির সমস্ত গোলমাল কম্‌তে কম্‌তে একসময়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ভরসা ছিল যে, বড়বৌ মুখে যাই বলুক, আর একগ্লাস বার্লি অন্তত দেবে, কিন্তু সে আশাও একসময়ে ছাড়তে হ'ল যখন দালানের ঘড়িতে একটা বাজার শব্দ কানে এসে পৌছল।

রাগে, ক্ষোভে, ক্ষুধায় ঘুমোতে পারেন না রামলোচন। ইদানীং আর বড়বৌ এঘরে থাকেন না, রোগ খুব বেশি নেই, মিছিমিছি সারাদিন খাটুনির পর বিশ্রামটা নষ্ট করতে চান না। অয়েলক্লথের ওপর রামলোচন শুয়ে থাকেন, কতকগুলো ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া পাশেই থাকে। 'পা পড়ে গেছে, হাত ত আর যায়নি!' ঝঙ্কার দিয়ে বলেন বড়বৌ, 'আমি কি আর দিনরাত ঐ করব?'

অবশেষে ঘড়িতে দুটো বাজল। কিছুতেই আর শুয়ে থাকতে পারেন না রামলোচন। নিজের অনাহার এবং ভাল ভাল খাদ্যের কল্পনা তাঁকে পাগল ক'রে তোলে। শেষ পর্যন্ত একটা অদ্ভুত মতলব মাথায় যায়

ওঁর, কোনমতে বিছানার ধারে এসে দেহের ওপরের অংশটা অনেকখানি ঝুলিয়ে দুই হাতে মেঝেটা স্পর্শ করেন, তারপর হাতের ওপর ভর দিয়েই একটু একটু করে এগিয়ে পা-দুটো টেনে তক্তপোষ থেকে নামিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। কাজটা দুর্বল শরীরের পক্ষে খুবই দুরূহ, হাত দুখানা থর থর করে কাঁপে, সমস্ত দেহ ঘামে ভেসে যায়। তবু রামলোচন হাল ছাড়েন না। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণপণ চেষ্টায় শরীরের নিচের অংশকে আকর্ষণ করতে থাকেন।

খানিকক্ষণ ধরে এম্‌নি চেষ্টা করার পর একসময় সেটা ধপাস্ করে আছ্‌ড়ে এসে পড়ে মেঝের ওপর। যন্ত্রণায় একটা চাপা আর্তনাদ করে ওঠেন রামলোচন, কিছুক্ষণ আর নড়তেও পারেন না। মনে হয় পা দুটো বুঝি ভেঙেই গেল। কিন্তু খানিকটা পরে আবার নিজেকে সাম্‌লে নেন, প্রবল ইচ্ছাশক্তিই জয়ী হয়ে ওঠে—দুটো হাতে ভর করে পা টানতে টানতে এগিয়ে যান দরজার দিকে, খোঁড়া কুকুর যেমন করে পেছনের পা-দুটো টেনে টেনে চলে—কতকটা সেই রকম করে।

তারপর দরজাটা ফাঁক্ করে দালানে মুখ বাড়ান।

আঃ—কী মুক্তি! কতকাল পরে এ ঘরের বাইরে পা দিলেন তিনি!

আজকাল একটা পাঁচ বাতির আলো দালানে জ্বলে সমস্ত রাত। তাঁর অসুখের সময়ই এ ব্যবস্থা হয়েছিল, ছেলেপুলের ঘরে খুবই সুবিধা হয় বলে সেটা টিঁকে গেছে। ক্ষীণ আলো, তবু তাইতেই সর্বাগ্রে চোখে পড়ল তাঁরই ঘরের প্রায় সামনে এঁটো পাতা-গেলাস-খুরী স্তূপাকার করা আছে, তার সঙ্গে দুচারটে গামলা বাল্‌তি প্রভৃতি বাসনও।

লোভে ও ঔৎসুক্যে চোখ ওঁর জ্বলতে থাকে। দেহে যেন

অপরিসীম বল অনুভব করেন। সামনে এগিয়ে লোলুপ-আগ্রহে সেই এঁটো পাতার রাশির মধ্য থেকে উচ্ছিষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করতে থাকেন—আধখানা লুচি, আলুর টুক্‌রো, মাছের কুঁচি, খানিকটা কাট্‌লেট, সিকিখানা চিংড়িমাছ, দরবেশের গুঁড়ো, পান্তুয়ার অর্ধেকটা—এমন কি আস্ত সন্দেশ রসগোল্লাও এক-আধটা খুঁজে পান। খেতে খেতে যেন নেশা লাগে, পাতাগুলি তুলে তুলে জিভ দিয়ে চাট্‌তে শুরু করেন। সারা মুখে, বুকে, সর্বাঙ্গে তরকারির ঝোল, মিষ্টির রস, দই লাগে—তবু ভ্রূক্ষেপ নেই।

অনেকক্ষণ ধরে খেয়ে খেয়ে একসময়ে শ্রান্ত হয়ে চুপ করেন রামলোচন। এইবার দালানটার দিকে ভাল করে তাকাবার অবসর মেলে।

ও কি, ওখানে শুয়ে কে! এত কাছে মানুষ ছিল তাঁর, আর এই কাণ্ড তিনি করেছেন এতক্ষণ ধরে, নিশ্চিন্ত হয়ে?

ভয়ে রামলোচনের বুকের মধ্যেটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করে শব্দ হয় সেখানে।

কিন্তু পরক্ষণেই আশ্বস্ত হন। না, ও ঘুমোচ্ছে। ঝি বোধ হয়, নতুন ঝি।

রামলোচনের মনে পড়ে ওঁদের পুরোনো ঝি নেত্যর মেয়ে সাবি বিধবা হয়ে মার কাছে ফিরে এসেছে, তারই সম্প্রতি বাহাল হবার কথা শুনেছেন বড়-বৌয়ের কাছে। সাবি যখন এগারো বছরের মেয়ে তখন বিয়ে হয়েছে—এখন সে-হিসেবে ওর কুড়ি-একুশ বছর বয়স হবার কথা। কেমন দেখতে হয়েছে কে জানে!

কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠে ক্রমশ। তেমনি হাতে ভর দিয়েই এগিয়ে যান তার দিকে। একটা মাদুরের ওপর সাবি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। পরিশ্রান্ত দেহ, কাপড়চোপড় যে এলিয়ে পড়েছে তা ও

টের পায়নি। ওরই মাথার ওপর আলোটা জ্বলছে, সেই আলোতে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রামলোচনের দৃষ্টি লুব্ধ হয়ে ওঠে বহুকাল পরে, তিনি স্থান কাল পাত্র সব ভুলে যান। সেই খাবারের রস ও ঝোল মাখা হাতেই ওর নধর যৌবনপুষ্ট কাঁধ ও হাতের ওপর হাত বুলোতে যান। হাতই যেন রসনা ওঁর, সাবির তরুণ যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করেন হাত বুলিয়ে বুলিয়ে।

কিন্তু সে স্পর্শে সাবির ঘুম ভেঙে যায়। মুহূর্ত কয়েক বিহ্বল ভাবে ঘুমচোখে তাকিয়ে থেকে ঘুম-ভাঙার অর্থ খুঁজে পায় সে। বৃদ্ধের লোলুপ দৃষ্টি এবং সর্বাঙ্গে ঐ ভোজ্যের রস মাখা বীভৎস চেহারা দেখে ভয়ে বিকট চীৎকার করে উঠ্‌ল সাবি। লাফিয়ে সরে গিয়ে কেঁদে চীৎকার ক'রে একেবারে হাট বাধিয়ে তুললে।

সে চীৎকারে বাড়িসুদ্ধ সবাই ছুটে এল। তাদের খানিকক্ষণ সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর বড় বৌ মেঝেতে মাথা খুঁড়তে লাগলেন লজ্জায় ও অপমানে, বাকি সকলে যার যা মুখে এল বলতে লাগল।

সেই অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার মধ্যে ব্যাকুল অসহায় আর্ত রামলোচন বিহ্বল-দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলেন চুপ করে—শুধু কী যেন একটা কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে ওঁর ঠোঁট দুটো থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল।

সহপাঠী

ওদের প্রথম আলাপটা হয়েছিল হঠাৎ—সামান্য একটা তর্কের ফলে। কল্যাণ ওর সহপাঠীদের এই মেয়েদের-গায়ে-পড়া স্বভাবটা একেবারেই দেখতে পারত না, আর তাই নিয়ে বাদানুবাদ হ'ত প্রায়ই। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে প্রথম কলেজে পড়তে এসেছে ওরা—ওদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ মনটা ঐ প্রথম স্ত্রী-সচেতন হয়ে ওঠে। কৈশোরের অবসানে যৌবনের প্রথম পদস্পর্শ টের পাওয়া যায় এই সচেতনতার মধ্যেই। তার ওপর হাতের কাছে যদি এতগুলি সহপাঠিনী থাকে, আর তারাও যদি কিছুটা লজ্জা, কিছুটা সঙ্কোচ এবং কিছুটা ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়ে একটা আল্‌তো ব্যবধান রচনা করে রাখে তাহ'লে সে সম্বন্ধে খানিকটা কৌতূহল ও আলোচনার স্পৃহা থাকাটা অস্বাভাবিক নয়, এমন কি খুব দোষেরও বলতে পারি না। ওটা পুরুষের সহজাত মানব-ধর্ম। মেয়েরা যদি ঐ আল্‌তো ব্যবধানের ভাবটা কিংবা ঔদাসীন্যের মিথ্যা মুখোষটা ঘুচিয়ে দিয়ে সহজ হতে পারতো তাহ'লে হয়ত এ পক্ষেও কৌতূহল যেত অনেকটা ক'মে। কী জানি—অন্তত তাই মনে হয় আমাদের।

যাই হোক—বলছিলুম কল্যাণের কথা। কল্যাণ সেদিনও বিরক্ত হয়ে বিনয়ের দলকে তিরস্কার করছিল। বলছিল, 'তোরা অমন বেড়ালের মত ছোঁক ছোঁক করে বেড়াস কেন বল্ ত? সবে ত ইস্কুল থেকে বেরিয়েছিস, কিছুদিন পড়াশুনো কর্ মন দিয়ে—তা নয়, দিনরাত ঐ সব আলোচনা ছাড়া কথা নেই। বিজয়া কেমন ক'রে গেল, ললিতা মিছিমিছি কী রকম জানলা দিয়ে চেয়ে থাকবার ভাণ করে—এসবে

তোদের দরকার কি? কথা কইবার ইচ্ছে হয় সোজাসুজি গিয়ে কথা ত কইলেই পারিস। ক্লাস-ফ্রেণ্ড্ ত।'

বিনয় বললে, 'কৌতূহল বুঝি শুধু আমাদেরই মনে করিস; ওদের কি কম—ভাণ করে শুধু। আমরা সোজাসুজি চেয়ে থাকি, ওরা আড়ে চায়।'

কল্যাণ আরও বিরক্ত হয়ে বলে, 'বেশ করে। তোদের কি? ওরাও পড়তে এসেছে তোরাও এসেছিস্—অন্য ক্লাস-ফ্রেণ্ডের মত ওদের দেখতে পারিস না কেন?'

ফট্ করে সুহাস বলে বসল, 'তুই পারিস?'

'কেন পারব না? না পারবার কি আছে?' বিস্মিত হয়ে তাকায় কল্যাণ।

'যা-যা! মুখে সবাই অমন বলতে পারে।, পারিস গিয়ে আলাপ করতে—যেমন নতুন ছেলে এলে আমরা সহজে করি? পারবি ঐ নতুন মেয়েটার কাছে গিয়ে কথা কইতে?'

'নিশ্চয়ই পারি। কী হয়েছে? মনে পাপ থাকলেই সঙ্কোচ আসে। আমার ত মনে পাপ নেই। কেন পারব না?'

'কত বাজী?' বিনয় বলে ওঠে।

কল্যাণ বললে, 'বাজী রাখতে চাই না, ওটা জুয়োখেলা। তবে আমি কাজটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

কথাটা উঠেছিল ঐ নতুন-ভর্তি-হওয়া মেয়েটিকে নিয়েই। বেশ ফুটফুটে চেহারা—খুব ছেলেমানুষের মত দেখতে। সতেজ সরল কৈশোরের ছাপ ওর মুখে চোখে—ওকে দেখলে তরুণ ছেলেদের চঞ্চল হবারই কথা।

কল্যাণ বসেছিল জানলার কাছে—হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কী যেন মেয়েটার নাম? রমা—না?'

তারপর সটান রমার সীটের কাছে গিয়ে বললে, 'ভাই রমা, শুনেছি তোমার কাছে পেন্সিল-কাটা ছুরি আছে—দেবে একবার ?'

কলেজে ভর্তি হয়ে পর্যন্ত সে-ই যে বিশেষ-করে ছেলেদের লক্ষ্য এবং আলোচনার উপলক্ষ্য হয়ে উঠেছে রমাও তা জানত। এবং মধ্যে দু-একবার যে আলাপের চেষ্টা চলেনি তাও না—সুতরাং এটাকেও সেই চেষ্টারই জের ভেবে রমার ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল, কিন্তু কল্যাণের মুখের দিকে চেয়ে আসল সহজ ভাবটা চিনতেও ওর বিলম্ব হ'ল না। একটু হেসে ওর গলার হারের সঙ্গে আটকানো ছুরিটা বার করে দিলে।

পেন্সিল কাটা শেষ করে কল্যাণ ছুরিটা ফিরিয়ে দিতে গিয়ে একটু তিরস্কারের ভঙ্গিতেই বললে, 'তোমাদের সব ক'জনেরই শাড়ির আঁচল দেখি বেঞ্চির তলায় লুটোচ্ছে, একটু সাবধান হয়ে বসতে পারো না ? অকারণে ময়লা ত হয়ই—দুনিয়ার যত রোগের বীজাণুও ঐ সঙ্গে ঘরে যায়। ওটা আবার কী এমন ফ্যাশান।'

মেয়েরা অপ্রতিভ হয়ে কাপড় ঠিক করে বসল। রমা কিন্তু এই ছেলেটির সহজ ব্যবহারে খুশি হয়েছিল, সে আর সমীহ করে চলবার কোন কারণ খুঁজে পেলে না। চিমটি কেটে বললে, 'আপনাদেরও কোঁচা কম লুটোয় না—'

'সেটা আরও বেশি নিন্দার্হ—তাই বলে তোমরা কেন সে বদ্-অভ্যাসটা বহন করে চলবে।'

জবাবটা নিজের সীটে ফিরে যেতে যেতেই দিয়ে গেল কল্যাণ।

সহপাঠীদের কেউ সেদিন বাহবা দিল, কেউ হ'ল ঈর্ষিত। কিন্তু সেই উপলক্ষ্য করেই এদের পরিচয়টা জমে উঠল দ্রুত।

কল্যাণ ছেলেটি কিছু অদ্ভুত। সে একটা স্কলারশিপ নিয়ে এসেছে, ভাল ছেলে ব'লে সবাই ওকে খাতির করত, কিন্তু ওর ব্যবহারে কোথাও

কোন অহঙ্কার বা সঙ্কোচ ছিল না। সে ভাল-মন্দ সবাইকার সঙ্গেই সমানে মিশত, পড়াশুনোর ব্যাপারেও অক্লান্ত ভাবে সবাইকে সাহায্য করত। তবে একটা মুরুব্বিয়ানার ভাব ছিল ওর মজ্জাগত—যদিও ঠিক সেটা পিঠ-চাপ্ড়ানোর মত অসহ্য কিছু নয়। অভিভাবকদের মতই স্নেহ মেশানো থাকত ওর ব্যবহারে ব'লে সেটা সকলে নির্বিবাদে মেনে নিত। লম্বা একহারা চেহারা, শ্যামবর্ণ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল সর্বদাই অবিন্যস্ত থাকত। সেটাকে দুরস্ত করবার চেষ্টা ওরও বিশেষ ছিল না—করলেও থাকত কিনা সন্দেহ। চোখের চশমাটা ছিল পুরু, চশমা খুললে বিশেষ কিছু দেখতে পেত না। এক কথায় চেহারা নিয়ে গর্ব করবার মত কিছু ছিল না ওর—অসাধারণত্ব ত নয়ই। শুধু চশমার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল চোখ দু'টো বুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় দিত। সাধারণত লেখাপড়ায়-ভাল ছেলেরা একটু যেমন আপন-ভোলা হয়—চোখের চাহনিতে ওর সে ঔদাসীন্য মোটেই ছিল না। বরং ও কাছাকাছি থাকলে সবাই অস্বস্তি বোধ করত—কখন্ কি দেখে ফেলে আর তিরস্কার করে এই ভয়ে।

রমার ছিল ঠিক উল্টো। ছেলেমানুষের মত মুখ ওর—ছিপছিপে সুশ্রী গড়ন। বিনয় বলত dainty figure—fragile-ও বটে; ওর স্বভাবটাও ছিল হাল্কা—মিষ্টি ধরণের। লেখাপড়ায় যতটা সাধ ছিল, ততটা সাধ্য ছিল না, তাই কল্যাণের সাহায্য পেয়ে ও যেন বেঁচে গেল। ক্লাসে একদিনও পুরো নোট্ নেওয়া ওর ঘটে উঠত না—ফলে প্রায় প্রত্যহই কল্যাণের খাতা থেকে টুকে নিতে হ'ত, তার মধ্যেও বেশির ভাগ দিন কল্যাণই ওর খাতা টেনে নিয়ে লিখে দিত। কল্যাণের মত বুদ্ধিতে ধার ছিল না রমার, প্রোফেসারদের কথাও সে যেমন ভাল বুঝত না, কল্যাণের কথাও বুঝতে পারত না। তার কারণ, ওদের

বোঝাটা যেত লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে, রমার বোঝাটা চলত খুঁড়িয়ে।
কিছুক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করে কল্যাণ যখন দেখত রমার দৃষ্টিতে শূন্যতা বা বিহ্বলতা এসেছে তখন সে চটে উঠত—গুরুজনের মতই তিরস্কার করত, এমন কি এক-আধ দিন বোধ হয় কান মলেও দিতে গেছে। কিন্তু রমা তাতে ক্ষুণ্ণ হ'ত না। ঈশ্বর তাকে যত নির্ব্বুদ্ধিতাই দিন, মিথ্যা আত্মসম্মান-জ্ঞান দেননি। সে সবিনয়ে এবং মধুর হাস্যে ওর তিরস্কার মেনে নিত, আর তাতে শেষ পর্যন্ত ওরই জয় হ'ত। কল্যাণ আবার শুরু করত গোড়া থেকে।

অবশ্য শুধু রমাই নয়—ক্রমশ কল্যাণের আরও অনেকগুলি ছাত্রী জুটল। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মানসিক দৈন্য বা হ্যাংলামি না থাকায় সহপাঠিনীরা সবাই ওকে সম্ভ্রমের চোখে দেখতে শিখলো। আর বোধ হয় সেইজন্যই রমার সঙ্গে কল্যাণের বন্ধুত্বটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেও সেটা কারুর চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকেনি, ওদের নিজেদের ত নয়ই। সম্পর্কটা সহজ বন্ধুত্বেরই ছিল আগাগোড়া।

এমনি করেই চলল কলেজ-জীবন—হঠাৎ ফিফ্থ্ ইয়ারে উঠে কিছুদিন পড়বার পরই কল্যাণ পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল। প্রথমটা ওর খেয়াল মনে করে রমা বিশেষ ব্যস্ত হয়নি, কিন্তু ক্রমে যখন এক এক করে পনেরোটি দিন কেটে গেল তখন সে আর চুপ করে থাকতে পারল না। কল্যাণের বাবাও কোন খবর জানতেন না—ওঁরাই বার বার ফোন্ করতে লাগলেন রমার কাছে। কেন গেল এবং কোথায় গেল কিছুতেই ভেবে পায় না ওরা। ইদানীং কিছুদিন ধরেই কল্যাণ একটু অন্যমনস্ক থাকত—একি তারই ফল? কে জানে। অথচ কল্যাণকে যে ওর বড় দরকার। এতটা যে দরকার তা এতদিন রমা

বুঝতেই পারেনি, ওর জীবনের সঙ্গে সে যে এমন করে জড়িয়ে গেছে, নিশ্বাসের মতই রমার জীবনে সে যে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, এ-রকম সন্দেহও কখনো করেনি রমা। কিন্তু এবার আর আত্মপ্রবঞ্চনা করা চলল না। রমা খবরের কাগজে ব্যক্তিগত কলমে বিজ্ঞাপন দিলে, 'বন্ধু, ফিরে না এসো—কোথায় আছ জানাও। তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।'

চিঠি এল সুদীর্ঘ সাতদিন প্রতীক্ষার পর। ঠিকানা নেই—পোস্টমার্ক বীরভূমের। তাতে লেখা ছিল, 'রমা—যে দেশে আছি সেখানে খবরের কাগজ চোখে পড়বার সম্ভাবনা নেই। কাল শহরে এসে দৈবাৎ পুরোনো কাগজখানা চোখে পড়ে গেল। চিঠি দেবার সময়ও নেই—ইচ্ছেও নেই। তোমরা ব্যস্ত হয়েছ সন্দেহ ক'রে এখানা লিখলাম।

'কিছুদিন ধরেই পড়াশুনো করার কোন প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছিলুম না। কী হবে এই এম-এ পাশ ক'রে বলতে পারো? হয় চাকরি, নয় আইন প'ড়ে ওকালতি করা, নয়ত বড়জোর অধ্যাপনা—এমনি আরও কয়েকটি ছাত্রছাত্রীর মাথা খাওয়া, অর্থহীন শিক্ষার বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে; কিংবা বিলেতে গিয়ে একটা ডিগ্রি নিয়ে চাকরি ও বিয়ের বাজারে দর বাড়ানো—এই ত? তোমাদের অবস্থা আরও খারাপ। কেন পড়ছ তা জানো না—নারী-প্রগতি ও স্ত্রী-স্বাধীনতার একটা ভাসা-ভাসা কথা মনে আছে, এই পর্যন্ত। এম-এ পাশ ক'রে বসে থাকবে কবে আই-সি-এস্ কিংবা আই-এম-এস্ পাত্র জুটবে এই ভরসায়। লেখাপড়া হয় না কিছুই, মাঝখান থেকে সাধারণ যে পাত্রের গলায় মালা দিয়ে সুখী হতে পারতে তাদের সম্বন্ধে আসে মনের মধ্যে অবজ্ঞা—জীবন সম্বন্ধে আশা যায় বড় হয়ে। ফলে, পাত্র জোটে না—যৌবন এবং তার

আনুষঙ্গিক যা কিছু হারিয়ে বৃদ্ধবয়সে আধবুড়ো পাত্রের গলায় মালা দিয়ে জীবন যায় ব্যর্থ হয়ে। এই ত দেখি গ্রাম ঘরে ঘরে। কিন্তু কেন? শিক্ষা বলতে ওটা বোঝায় না। এতবড় দেশের চল্লিশ কোটি লোক আজ মরতে বসেছে, কি করে বাঁচবে তা জানে না। সেই বাঁচার মন্ত্র শিখতে হবে—শেখাতে হবে। দেশের দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে, পুঞ্জীভূত জঞ্জাল জাগছে জীবনের পথে। একদিন যখন এর হিসাব-নিকাশ হবে যখন সমস্ত জাতটা যাবে দেউলে হয়ে—তখন আমরা মুষ্টিমেয় একদল নরনারী শুধু দেশের এই জনতা থেকে দূরে সরে আছি বলেই বাঁচতে পারব না। সে বন্যায় সবই ভেসে যাবে। তাই দেশের সমস্যাটা আজ কোথায়—বাঁচবার বা বাঁচাবার আজও কোন পথ আছে কিনা সেইটে দেখতেই এখানে চলে এসেছি। বাবাকে বলে এলে তিনি আসতে দিতেন না, মুন্সেফের চাকরি হাতে করে তিনি বসে আছেন, সেই সঙ্গে এক বন্ধুর কন্যা এবং হাজার কতক টাকা। গত দুতিন-পুরুষ যে সঙ্কীর্ণ বাঁধা-রাস্তায় চলেছে তার বেশি কোন রাস্তার সন্ধান তিনি রাখেন না, রাখতে চানও না। সুতরাং বিদায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি।

'এখানে আছি এক ডোম-পল্লীতে। আশেপাশে মুচি-নমঃশূদ্রদের দল। মদ আর যৌনব্যাধিতে এরা ডুবে আছে। পেটে অন্ন নেই—পরনে বস্ত্র নেই। আছে শুধু ম্যালেরিয়া এবং কদাচার। আছে অপরিসীম অশিক্ষা ও দারিদ্র্য। আজ সমস্ত শিক্ষার মোহ ঘুচিয়ে ফেলে একটা জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দেশের সমস্যা একটি মাত্র লোকই কিছুটা দেখতে পেয়েছেন, মহাত্মাজী, কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত করিনি। যে মূঢ় আজও তাঁর কথা শুনতে পেলে না—সামনের ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে দেখতে পেলে না, তার জন্য আজ দুঃখ হয়। আমিও যে শুনেছি তা বলতে পারি না, শোনবার চেষ্টা করছি মাত্র।

কান পেতে আছি সেই বজ্রগর্জনের দিকে যা মহাপ্রলয়ের আভাষ রূপে বেজে উঠবে একদিন।

'তোমাকে কী বলতে পারি রমা? কিছুই বলবার নেই। পারো ত তোমাদের জীবন এবং এই শিক্ষার কী উদ্দেশ্য—কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা—বোঝবার চেষ্টা ক'রো। হয়ত সে সময়ই পাবে না। তোমার বাবার হাতে বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ার পাত্র আছে জানি; তোমার দিদির একটি বিলেত-ফেরত পাত্র জুটলেই একসঙ্গে দুটি কন্যাকে পাত্রস্থ করবেন। তিনি সেইজন্যই তোমাদের কলেজে পড়াচ্ছেন।···চিঠি দেবার চেষ্টা ক'রো না। ঠিকানা দেব না—ঠিকও নেই কিছু কখন্ কোথায় থাকি। বোলপুরের পোস্ট-মাস্টার আমার বিশেষ বন্ধু, তাঁকে জানালে প্রয়োজনীয় সংবাদ ঠিক পৌছবে আমার কাছে। তবে তাঁর কাছেও ঠিকানা পাবে না। ইতি—তোমার বন্ধু।'

যদিও সহপাঠী তবু কল্যাণকে নাম ধরে ডাকতে রমার সঙ্কোচে বাধত। 'বন্ধু' নামটি তারই দেওয়া। এ নিয়ে বিদ্রূপ কল্যাণ কম করেনি—বলেছে যে, পুরুষ যে মেয়েদের চেয়ে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এ কথাটা মেয়েরাই বেশি করে জানে, তাই নাম ধরে ডাকায় ওদের এত সঙ্কোচ। তবু কল্যাণ যে ওর এই সঙ্কোচটুকু পছন্দ করে রমা তা বুঝত। আজ কল্যাণও সেই সম্বোধনটাই মেনে নিয়েছে।

কিন্তু এ কী হ'ল! কল্যাণ কী বলেছে তা রমা বুঝতে পারলে না—বোঝা বোধ হয় সম্ভবও ছিল না। শুধু এইটুকু বুঝলে যে, দেশ ও দেশবাসী-রূপ অন্ধকার এবং না-জানা একটা মহাসমুদ্র ওর কল্যাণকে গ্রাস করেছে, আর বোধ হয় কোনদিনই সে তাকে ফিরে পাবে না। ওর কিছুটা প্রভাব কল্যাণের ওপর এতদিনে বিস্তার করতে পেরেছে এমনি একটা গর্ব ছিল মনে মনে, আজ সেটা ত ভূমিসাৎ হ'লই—যে শক্তি

আজ তার কাছ থেকে এমন করে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত দেশমাতৃকা সম্বন্ধে মনে মনে একটা বেদনাতুর ঈর্ষার ভাবও অনুভব করতে লাগল।

তবু কল্যাণ হারিয়েই গেল, রমা অনেক চেষ্টা করেও খোঁজ পেলে না। শান্তিনিকেতন দেখতে যাবার ছল করে নিজে বোলপুর গেল, কিন্তু ওখানকার ছোকরা পোস্টমাস্টারটির কাছ থেকে কল্যাণের কোন খবরই বার করতে পারলে না। সেই স্বল্পভাষী যুবকটির বিনয়ের বর্মে ওর যৌবন, রূপ এবং রমণীয় মাধুর্যের সমস্ত অস্ত্রগুলিই ঠেকে' একে একে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

ফিরে আসতে হ'ল ওকেও। বীরভূমের গ্রামে গ্রামে বন্ধুকে খুঁজে বেড়াবার মত সময় এবং সুযোগ ওর যখন নেই তখন আর উপায় কি! কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসে ও বুঝলে এবং নিশ্চিত করে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে কল্যাণ কখন্ ওর সহপাঠীর পদ থেকে আর একটু বেশি অধিকার পেয়েছিল তা ও নিজেই এতদিন বুঝতে পারেনি। আজ আর আত্মপ্রবঞ্চনা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়—কল্যাণকে ওর চাই-ই, সে ওর জীবনে অপরিহার্য, ওর আত্মার সঙ্গে তাকে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

এবার ও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে নিজের নাম গোপন করে —'বন্ধু, দোহাই তোমার, ফিরে এসো। একদিন অন্তত দেখা করে যাও, আমি আমার কথা না বলে আর থাকতে পারছি না।'

বিজ্ঞাপনের কাটিংটা পাঠিয়ে দিলে সেই পোস্টমাস্টারের নামে।

এবার জবাব এল দ্রুত। কল্যাণ লিখেছে—'আমার স্কুল-কলেজ মিলে সহপাঠী ও সহপাঠিনীর দল প্রায় দু'শ। কই কারুরই ত আমার সম্বন্ধে এত আকুলতা দেখা যাচ্ছে না। তাইতে সন্দেহ হয় যে, তোমার

মনে সেই পুরনো নাকি-কান্না—যাকে কবিরা বলেন ভালবাসা—তার একটা ছোঁয়াচ আছে। সেইজন্যই আর কোনদিন দেখা করব না। এখন যা সময়, তাতে ওসবের অবসর নেই যে শুধু তাই নয়—থাকা উচিত নয়। স্ত্রী-পুরুষের ঐ সম্পর্কটা আমাদের, বিশেষ করে বাঙালীর জীবনে বড় বেশি এসে পড়েছে, তাই তার পায়ে পদে পদে বাধা। হিন্দুস্থানী এবং উড়েরা স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে তোমাদের কলকাতাতে এসে কি-ভাবে টাকা রোজগার করছে! কিন্তু বাঙালীর ছেলেরা সে কথা ভাবতেও পারে না। বিদেশে চাকরি করতে গেলে বাসা খোঁজে। তোমরাও আজকাল শরৎবাবুর নভেল আর সিনেমার দৌলতে বড্ড মেয়েলী হয়ে উঠেছো। পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের চেয়ে তোমরা বেশি শক্ত বেড়ী রচনা করো।

'ওসব এখন থাক্—সামনে যে কাজ পড়ে আছে তার মধ্যেই জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতাকে খুঁজে নাও। কেন, পুরুষকে না জড়ালে কি মেয়েদের জীবনে কোন কাজ নেই—কোন সার্থকতা নেই?'

এই তিরস্কারে মর্মান্তিক আঘাত পেল রমা। পড়ায় মন দিলে বেশি ক'রে। কল্যাণকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করার জন্যই যেন রোজ সিনেমাতে যেতে শুরু করলে। শাড়ি ও প্রসাধনের ব্যয় বেড়ে গেল চতুর্গুণ। বার বার নিজের মনের কাছে আস্ফালন করতে লাগল যে এটা কল্যাণের নিছক্ স্পর্দ্ধা। সাধারণ স্নেহ ও উৎকণ্ঠাকে সে অনায়াসে তার প্রতি ভালবাসা বলে গ্রহণ করল কি ক'রে? নিজের সম্বন্ধে এত উঁচু ধারণা তার? দেশের কাজের কতকগুলি বাঁধা বুলি আউড়ে নিরক্ষরদের মধ্যে গিয়ে বাস করলেই দেশের কাজ হয় না। চাষারা কোনদিন কোন দেশের স্বাধীনতা আনেনি। এনেছে শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরাই। শরৎবাবু ঠিকই বলেছেন, ঐ সব মদ্যপায়ী, অশিক্ষিত,

অনাচারগ্রস্ত ছোটলোকরা কোনদিন আইডিয়ার জন্যে প্রাণ দিতে পারবে না। মহাত্মাজী থেকে শুরু করে ক্ষুদে মহাত্মা কল্যাণ বাবুর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করলেও না।

কিন্তু তবু যেন সব ব্যর্থ হয়ে যায়। সমস্ত কাজ ও অকাজের মুহূর্তগুলো ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। এ যে কী হ'ল তা ও বোঝে না। কিছুদিন পরে সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে বিস্তর বই কিনে এনে পড়তে বসল—লেনিন ও স্ট্যালিনের জীবনী, মার্কস্‌বাদ, যা পেলে সব পড়ে শেষ করল কিন্তু তাতে ওর দেশের সমস্যা বা তার সমাধান কোনটারই হদিশ পেলে না। কিনলে গান্ধীজীর জীবনী, তাঁর বক্তৃতাবলী—পুরোনো 'হরিজন' বাঁধাই-করা চেয়ে এনে পড়লে। ওর মাথায় এ সব কথা ঢোকে না যেন কিছুতেই, তবু মন দিয়ে পড়ে। এমনি করে বিস্তর সময় নষ্ট করে এক সময় রমা হার মানলে। আবার স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে, দেশও নয়—দেশবাসীও নয়, ওর মন পড়ে আছে নিজের সমস্যার ওপরেই। ওর প্রয়োজন একটি বিশেষ দেশবাসীকে। তার জন্যই ও সব-কিছু করতে পারে—নইলে কিছুই না।

ইতিমধ্যে ওর বাবা মেয়ের রকম-সকম দেখে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ইঞ্জিনিয়ার পাত্রটি ছিল হাতের কাছেই, রূপসী স্ত্রী এবং মোটা যৌতুক সবসুদ্ধ যায় দেখে তিনি এম-এ পাশের মায়া ত্যাগ করতে রাজি হলেন। পরীক্ষার দিনের আগেই বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল। রমা মজ্জমান ব্যক্তির মত পরীক্ষারূপ তৃণগাছি আঁকড়ে ধরতে গেল—বললে, 'এই ক'টা মাস ত, পরীক্ষাটা অন্তত দিতে দাও।' কিন্তু ওর বাবা সে সব যুক্তি বাতিল করে দিলেন। বললেন, 'পরীক্ষাটা বিয়ের পরেও দেওয়া যায়। এতদিনের পড়া, এই কটা দিনে কি এসে যাবে?'

রমা এবার চোখে অন্ধকার দেখলে। যেটুকু দ্বিধা ছিল সব চলে

গেল। নিজের মনে যতদূর দৃষ্টি চলে একটি নির্মম নিরাসক্ত লোক ছাড়া আর কারুর স্থান সেখানে দেখতে পেলে না। পোস্ট-মাস্টারের জিম্মায় 'তার' গেল—'আমি বড় বিপন্ন। আত্মার এই মৃত্যু থেকে আমাকে কি বাঁচাবে না? তোমার কাছেই আমি নতুন করে পাঠ নেব। তোমার কাজে টেনে নাও আমাকে। আর কোন দাবী নেই।'

'তার' পাঠাবার পরে তিনদিন কেটে গেল, কোন উত্তর নেই। বিয়ের আর এগারো দিন মাত্র বাকি—পাকা দেখার আর দুদিন। পাকা দেখার পর কথার খেলাপ করতে সে পারবে না, তাতে বাবাকে অপমান করা হয়। নিজেরও ঐ আশীর্বাদ নেওয়ার মধ্যে কোথায় একটা স্বীকৃতি থাকে—তারপর চুক্তিভঙ্গ করা অন্যায়। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ও অন্যমনস্কভাবে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোচ্ছে এমন সময় চমক ভাঙল ওর অতি-পরিচিত একটা হাতের ঝাঁকুনিতে। কাঁধের ঠিক এই জায়গাটা ধরে ঝাঁকানি দেওয়া কল্যাণের বহুদিনের অভ্যাস। শুধু তাকে নয়—পরিচিত সবাইকেই সে এমনি করে ঝাঁকানি দিত।

এতদিন পর কল্যাণকে সত্যি-সত্যিই সাম্‌নে দেখে অকস্মাৎ রমার চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। কথা কইতে গিয়ে ঠোঁটই কাঁপল শুধু—স্বর বেরোল না।

কল্যাণ ওর অবস্থা দেখে সবই বুঝল, একটু মুচকে হেসে ওকে টেনে নিয়ে গেল গোলদীঘির মধ্যে। তারপর ওরই মধ্যে যত দূর সম্ভব একটা নির্জন স্থান বেছে নিয়ে বসে বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করলে, 'তারপর?'

রমা ওকে জানত। কোন রকম মান-অভিমান করা বৃথা। সেন্টিমেন্টালিটির বিন্দুমাত্র ধার ধারে না কল্যাণ। তাই সে কোন মতে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বললে, 'তোমাকে যা লিখেছি তার বেশি

একটুও বলবার নেই। বিয়ে করা এখন আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আমাকে তোমার কাজে টেনে নাও।'

কল্যাণ প্রশান্তমুখে ওর দিকে চেয়ে বললে, 'কিন্তু আমার কাজের মুস্কিল হচ্ছে এই যে, ওর প্রতি যার সত্যকার আকর্ষণ নেই সে ওর মধ্যে টিক্‌তে পারবে না, সুতরাং ও চেষ্টা ক'রো না রমা, ও বৃথা।'

রমা ইঙ্গিতটা বুঝেও না বোঝবার ভাণ করলে। আর সে চেষ্টায় ওর সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠল। বললে, 'কে বলেছে ওর প্রতি আমার আকর্ষণ নেই, তবে যেতে চাইছি কেন ?'

'যেতে চাইছ আমার জন্য,' স্থির দৃষ্টি ওর মুখের ওপর রেখে কল্যাণ উত্তর দিলে, 'আমার সাহচর্যটা তোমার কাছে বেশি প্রিয় বলে। হয়ত আমিও এটাকে মেনে নিতে পারতুম—এদিকে যদি আমারও কোন লোভ থাকত। কিন্তু যে পথ আমি বেছে নিয়েছি সেই পথই আমার সমস্ত মন অধিকার করে আছে, অন্য কোন কথা আমি ভাবতেও পারব না। তাই হয়ত কিছুদিন পরে তুমি হতাশ হবে, অথচ তখন আর তোমার ফেরবার পথ থাক্‌বে না। এখন যেটা নিশ্চিত এবং ধ্রুব হাতের কাছে পাচ্ছ সেটাকে ছেড়ো না রমা।'

অপমানে রমার কান দুটো গরম হয়ে উঠল, বললে, 'নিজের সম্বন্ধে তোমার এত উচ্চ ধারণা রাখা ঠিক নয়। শুধু তোমার লোভে আমি ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজন, এমন কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সবকিছু ছেড়ে যাচ্ছি, এত মূল্যবান তুমি নও। তোমার কাছে আমি প্রণয় ভিক্ষা করব না কোনদিন—ভয় নেই!'

কল্যাণ একটুও অপ্রস্তুত হ'ল না। বরং হেসে বললে, 'ওটা আমার নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা নয় বন্ধু, মেয়েদের সম্বন্ধে ছোট ধারণার ফল। যে সব মেয়েই এদিকে এসেছে তাদের প্রায় কাউকেই শেষ পর্যন্ত

রোম্যান্স না করে থাকতে দেখিনি। অথচ তারা সবাই ভাল ভাল মেয়ে—তারা টিকে থাকলে দেশের কত উপকার হ'ত।'

রমা উষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিলে, 'ব্যতিক্রমও থাকে বই কি, তোমার চোখ নেই তাই দেখতে পাও না।'

একটুখানি চুপ করে থেকে কল্যাণ বললে, 'তাহ'লে এখনও তোমার দেশের কাজে নামবার ইচ্ছা আছে?'

রমা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'আছে।'

'কিন্তু কাজও ত বিস্তর আছে, কর্মক্ষেত্রেরও অভাব নেই, বিশেষ করে আমার সঙ্গেই বা থাকতে চাইছ কেন?'

'তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে বলে, তোমার সঙ্গে থাকলে আমার সম্মান হয়ত অক্ষুণ্ণ থাকবে এই ভরসায়। মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার যেমন ধারণা, পুরুষদের সম্বন্ধেও আমার সেই রকম। তাই অপরিচিত লোকের সঙ্গে থাকতে ভয় হয়। নইলে তোমার একটুখানি সাহচর্যের জন্য এমন করে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি—এ কথা মনে ঠাঁই দিও না!'

কথাগুলো বলবার সময় শেষের দিকে সংযমের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও রমার গলা কেঁপে গেল।

কল্যাণ আবারও একটু হাসল। বললে, 'তাহ'লে এই কথা ত? কোনদিন তুমি আমার কাছে ব্যক্তিগত কোন স্নেহ আশা করবে না—আমার মন বা চিন্তার ওপর কোন দাবী-দাওয়া রাখবে না, এই প্রতিজ্ঞা করছ ত? একান্ত মনে কাজটাকেই তোমার ব্রত করবে—কেমন?'

এবার কণ্ঠস্বর দৃঢ় করে ফেলেছে রমা, সে উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ।'

'বেশ, তাহ'লে চল উঠি। আমার একটু কাজ আছে, এটা সেরে সাতটার ট্রেণ ধরতে হবে।'

রমা বিস্মিত হয়ে বললে, 'আজই, এখনই? একবার বাড়ি যাব না?'

'কী হবে আর বাড়ি গিয়ে?'

'কাপড়-জামা—'

'যেখানে যাচ্ছ—সেখানে লজ্জানিবারণের মত কিছু পাবে বৈকি! তার চেয়ে বেশি যেটা, সেটা ত বিলাস। তা ছাড়া, আমাদের এ কাজে কোন বন্ধন নেই, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা নেই—। সব সময় যিনি প্রস্তুত তিনিই কর্মী। যে-কোন কাজের জন্য যাকে ভেবে দেখতে হয়—প্রস্তুত হ'তে হয়, তাকে দিয়ে কাজ চলে না, কাজের আড়ম্বর চলে।'

বাবা—ভাই-বোন—সংসারের চিরপরিচিত আবেষ্টনী! ওর ঘরের বই-খাতাগুলো তেমনি ছড়ানো রইল। শাড়ি-জামাগুলো গুছোনো হ'ল না। কাগজ-পত্রগুলো পর্যন্ত কি-ভাবে রইল তার ঠিক নেই। মানস-চক্ষে সবগুলির ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়েই রমা যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

'আমার চিঠিপত্রগুলো যে নষ্ট করে আসা হ'ল না। তোমার চিঠিও যে রয়েছে তার মধ্যে—'

শান্তকণ্ঠে কল্যাণ উত্তর দিল, 'কী হয়েছে তাতে? মহৎকর্ম কিংবা বিরাট সর্বনাশ যখন মানুষের সামনে থাকে, তখন ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। কোন কিছুই যেন তোমার জীবন ও চিন্তাকে বেঁধে না রাখে, জড়িত না করে—এই হ'ল কর্মব্রতের সবচেয়ে গোড়ার কথা!'

একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস গোপন করে রমা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'বেশ, তাই চলো।'

রমা তেমনি একবস্ত্রেই কলকাতা ত্যাগ করলে। কলেজের খাতা ছিল কাছে, তারই একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বাবাকে চিঠি দিলে।

লিখলে—'শ্রীচরণেষু, বাবা, আমি বিয়ে করতে পারলুম না। আমাকে কেন্দ্র করে হয়ত অনেক আশাই আপনার মনে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু আমার পক্ষে তার একটাও সফল করা সম্ভব হ'ল না। আমি চললাম দেশবাসীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে—পারব কি না জানি না। কোন লজ্জাকর কিংবা অসৎ কাজের দ্বারা কোন দিন আপনার পরিচয়কে বিড়ম্বিত করব না এটা ঠিক—কিন্তু আপনিও আমাকে খুঁজে বার করার জন্য কোন হাঙ্গামা করবেন না। আমার বয়স এখন তেইশ, সুতরাং স্বেচ্ছায় যা করতে চাই তাতে কেউ বাধা দিতে পারবে না—শুধু মানুষের চোখে ব্যাপারটার হয়ত অন্য অর্থ দাঁড়িয়ে আপনাকে অপদস্থ করবে। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—'

কিন্তু ওর কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে রমা তার মনের মধ্যে একটা শৈত্য অনুভব করে বৈকি! সব উত্তাপ যেন নিমেষে নিভে যায়। বোলপুর থেকে সতেরো-আঠার মাইল গোরুর গাড়ি করে যেতে হয়—বিজন পল্লী-গ্রাম, ডোম আর মুচিই বেশি সেখানে। তাদের প্রত্যেকেই দুশ্চরিত্র এবং মদ্যপ। কোন নীতির ধার ধারে না তারা—তাদের জীবনে কোন সামাজিক বন্ধন নেই। পরিশ্রম কম ক'রে দিনরাত তাড়ি কিংবা পচাই খেলে যা হয়—দারিদ্র্যের সর্ব শেষ ধাপে নেমে এসেছে। অথচ সে জীবনের জন্য কোন ক্ষোভ বা দুঃখ নেই, পরিবর্তনের জন্য এতটুকু প্রয়াস নেই। চালে খড় নেই, পরনে বস্ত্র নেই, শয্যার মধ্যে খেজুর পাতার চ্যাটাই, বাসনের মধ্যে মাটির হাঁড়ি আর নারকেলের মালা। যৌনব্যাধিতে প্রতেকের আপাদ-মস্তক পরিপূর্ণ। এদের মধ্যে বাস করতে হবে?

কল্যাণ একটু হেসে বললে, 'এই সব মূঢ়-ম্লান-মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—বুঝেছ বন্ধু? এদেরই মানুষ করে তুলতে হবে।'

তা হোক্—কিন্তু আর কেউ নেই যে গ্রামে। কথা কইবে কার সঙ্গে? থাকবে কোথায়?

কল্যাণ যেখানে থাকে সেটা একটা ভাঙা ঘর, খানিকটা চালা ছিল, বাকিটা নিজেই খেজুর পাতা চাপা দিয়ে নিয়েছে। কার যেন একটা বাড়ি ছিল, তার পরিবারের অর্ধেক মরে বসন্তে, বাকি অর্ধেক কলেরায়। তারপর সে-ও সাপের কামড়ে মারা গেলে ঘরটা পোড়ো হয়েই ছিল—সম্প্রতি কল্যাণ দখল করেছে। সেখানে থাকে ওর একটা ছেঁড়া চ্যাটাই, খানকতক বই, খাতা, কলম, গোটাকতক হাঁড়িকুঁড়ি আর কিছু ওষুধ।

রমাকেও সেইখানেই নিয়ে গিয়ে তুললে। রমা সভয়ে বললে, 'যদি সাপে কামড়ায়?'

'তা কামড়াতে পারে। তবে এরা বলে কি জানো, সাপের লেখা আর বাঘের দেখা। অদৃষ্টে লেখা না থাকলে সাপ কামড়ায় না। আমিও ত এতদিন রইলাম!'

'আমিও কি এই ঘরে থাকব?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে রমা।

'নিশ্চয়ই। ঘর আর পাবো কোথায়। চারটি খড় জোগাড় করে দেব ওবেলা, তার ওপর একটা চট পেতে নিলেই দিব্যি শোওয়া চলবে।'

'কিন্তু—এই এক ঘরে?' মরীয়া হয়ে বলে রমা।

'আর ঘর কই?' কল্যাণ ওর মুখের ওপর সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, 'তা-ছাড়া তুমি যে স্ত্রীলোক সেটা ভুলবে বলেই ত এসেছ। এখানে আমাদের অন্য পরিচয় নেই, শুধু কর্মী। আমার পুরুষ-বন্ধু যারা আসে, এ অঞ্চলে যারা কাজ করছে, তারা ত এই চ্যাটাইতেই আমার পাশে শোয়। কৈ, তারা ত কোন আপত্তি করে না!'

তারপর হেসে ফেলে বললে, 'আর একটা কথাও মনে রেখো। তোমার রূপ এবং যৌবনের কথাটা তুমি এবং আমি যদি বা ভুলে যাই,

এরা ভুলবে না। সুতরাং আমার কাছে থাকাই নিরাপদ। এদের ঐ পুরুষগুলোকে অনাহারে আর অত্যাচারে শীর্ণ দেখছো বটে, কিন্তু মদ পেটে পড়লে একেবারে মরীয়া হয়ে ওঠে। একটু সাবধানে থাকতে হবে বৈ কি।'

রমা অভিভূতের মত চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এসব কথা সে বইতে যতই পড়ে থাক্, তার কোন বর্ণনার সঙ্গেই এই উদ্ভট জীবনের যেন মিল নেই। এমন কি রাশিয়ার কর্মীদের যে সব বিবরণ পড়েছে, তাও ত এত ভয়ঙ্কর নয়।

হঠাৎ কল্যাণের যেন একটু সন্দেহ হ'ল। সে ঘরে এসে কাছে দাঁড়িয়ে আন্তরিকতার সুরেই বললে, 'তুমি কি তা হ'লে ফিরে যেতে চাইছ রমা? এখনও দেখো, ব্যাপারটা এমন কিছু খারাপ দাঁড়ায়নি—এখনও হয়ত সব দিক বাঁচানো চলে। চুপি চুপি এখনও যদি তোমায় কলকাতায় রেখে দিয়ে আসি, তাহ'লে কেউ টেরও পাবে না—'

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে রমা উত্তর দিলে, 'না। যে পথ বেছে নিয়েছি, ভাল হোক মন্দ হোক সেই পথেই চলব।'

এ সম্বন্ধে অন্য কোন যুক্তির অবতারণা না করে প্রশান্ত মুখে কল্যাণ চারটি খড়ের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু কাজটাই বা কি?

নাইট্‌ ইস্কুল নয়, স্বদেশী শিক্ষা নয়, সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টাও নয়—এমন কি হাসপাতালও নয়। কতকগুলো চাষের বই আনিয়েছে কল্যাণ—তাই থেকে ওদের কাছে পড়ে শোনায় আর ওদের ভাষায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কী ক'রে চষলে ভাল ফসল হয়—জল কম হ'লে কী করতে

হয়—কেমন করে পোকার হাত থেকে ফসল বাঁচাতে হয়—এই নিয়েই তার মাথাব্যথা।

রমার প্রশ্নের উত্তরে সে বিদ্রূপের স্বরে বলে, 'লেখাপড়া? অক্ষর-পরিচয়? এদের? তুমি ক্ষেপেছ রমা! না খেতে পেয়ে মরে গেল দেশকে দেশ—এখন সব চেয়ে বড় শিক্ষা এদের এইটে, যাতে করে চাষটা ভাল করতে পারে। অনাহার আর রোগ, মদ আর কুপ্রবৃত্তি—এইগুলোর আগে প্রতিকার করি, তারপর লেখাপড়ার কথা ভাবব।'

'কিন্তু এগুলোর প্রতিকার করতেও ত কিছু লেখাপড়া শেখানো দরকার—' রমা প্রতিবাদ করতে যায়।

কল্যাণ বলে, 'এখনও তার অনেক দেরি। এখন এই অবস্থায় যদি ইস্কুল খুলে বসো ত একটিও ছাত্র-ছাত্রী পাবে না তুমি। শ্লেট-পেন্সিল দেখলে ওরা ভয় পায়। মোটামুটি স্যানিটেশনের একটা প্রথম পাঠ দিতে পারলে বেঁচে যাই—তাতেই কারুকে কর্ণপাত করাতে পারি না। কলেরার কাপড় পুকুরে কাচতে নেই একথা বললে এরা পাগল ভাবে।'

'সে-ও ত অশিক্ষারই ফল।'

'তা ঠিক। কিন্তু শিক্ষাটাকে এরা নিজেরাই বর্জন করেছে—সে দিকে প্রীতি আনতে সময় লাগবে। আমি একটু ডিরেক্ট্ মেথডেরই পক্ষপাতী। সব চেয়ে দুঃখের কথা কী জানো, এরা চাষ করেই খায় অথচ চাষের নিয়মগুলোও জানে না। জলের অভাবে অর্ধেক বছর এই জেলাটায় চাষ হয় না, কিন্তু ওরা ধান বুনেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে আকাশের দিকে চেয়ে। অথচ এমন একটা কড়াই আছে যা পাথরের ওপর ছড়িয়ে দিলেও কিছু ফসল আমদানি হয়—সে কথাটা এদের মুখেই শোনা, তবু এরা সে চেষ্টা পর্যন্ত করে না। তাতে প্রাণধারণ ত হয়—নিদেন গোরু-বাছুরগুলো ত বাঁচে।'

রমার তবু দ্বিধা ঘোচে না। সে বললে, 'বেশ, তোমার যা কাজ তাই করো, আমি এদের লেখাপড়া শেখাবারই চেষ্টা করবো।'

ঈষৎ বিদ্রূপের আভাস ওর মুখে দেখা গেলেও কল্যাণ কোন প্রতিবাদ করলে না।

সেদিন আহার জুটল একেবারে তৃতীয় প্রহরে খানিকটা করে ডাল-ভাতে আর ভাত। ডাল-ভাতের সঙ্গে তেল নেই, ঘিয়ের কথা ত কল্পনা করাও যায় না। এখানে নাকি সকলেই এমনি তিনটে চারটের সময় ভাত খায়, যাতে রাত্রের আহারটা বাঁচে। কল্যাণও সুবিধা বুঝে এই ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তবে এদের মত সকালে ভিজে ভাত খায় না, কিছুই খায় না সে। জুটলে কোন দিন কিছু খায়—নইলে একেবারে এই ভাত। রমার গলা দিয়ে এ খাদ্য নামে না—বিশেষত যখন মনে পড়ে কাল দুপুরেও সে দুটো মাছের তরকারি, আলুর দম, এঁচোড়ের ডালনা দিয়ে ভাত খেয়েছে—। তবু সে প্রাণপণে চোখের জল দমন করে খায়। কল্যাণ বেশ সহজে খেয়ে যাচ্ছে কিন্তু—বরং ভাত একটু বেশিই খেলে সে। অন্যমনস্কভাবে এদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে করতে ফ্যান-সুদ্ধ ভাত, ডাল-ভাতে আর নুন দিয়ে অনায়াসে খেয়ে যাচ্ছে।

ওর দিকে আড়ে চেয়ে চেয়ে রমা লক্ষ্য করে দেখলে, কল্যাণ অনেক রোগা হয়ে গেছে আগের চেয়ে। চুলগুলো ওর এমনিই ঝাঁকড়া, রুক্ষ থেকে থেকে জট পাকিয়ে গেছে। মুখের রঙ হয়ে গেছে তামাটে। তবু তার সেই কঠিন কৃশ মুখের মধ্যে, তার রুক্ষ ললাটের ভ্রূকুটির মধ্যে কী যে আকর্ষণ আছে আজও—তা বিশ্লেষণ করে দেখতে পায় না রমা, শুধু মনে হয় এ'কে হৃদয় না দিয়ে উপায় নেই—এর জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেও সুখ। সে দৃষ্টির নিবিড় ঔদাসীন্যের মধ্যে, চরম নিস্পৃহতার মধ্যে যেন কোথায় একটা সর্বস্ব-বলিদানের আদেশ লুকানো আছে—

না দিয়ে উপায় নেই। ওর সমস্ত অন্তর একান্ত কামনায় উদ্বেল হয়ে উঠল, ভাতের গ্রাস সুদ্ধ হাতটা কাঁপতে লাগল থর-থর করে--

রাত্রে ওর ঘুম হ'ল না, তা বলাই বাহুল্য।

খড়ের ওপর চট বিছিয়ে শোওয়া—কিন্তু তাতেও বোধ হয় আট্‌কাত না। যার জন্য সে জীবনের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে, এই অদ্ভুত জীবন-যাত্রা, এই ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য এবং অনিশ্চয়তায় মধ্যে চলে এল—সেই লোকটি ওর থেকে বোধ হয় মাত্র চার হাত দূরে ঘুমুচ্ছে, অথচ তাকে স্পর্শ করবার পর্যন্ত উপায় নেই। ওর সেই রুক্ষ ঝাঁকড়া চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাবার ইচ্ছা রমার দীর্ঘদিনের—আজ এই নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে ওর সান্নিধ্য অনুভব করতে করতে সে ইচ্ছা আরও তীব্র হয়ে উঠল ; তবু উপায় নেই, প্রাণপণে নিজের হৃদয়দৌর্বল্যকে দমন করে সে কল্যাণের নিশ্চিন্ত ও নিয়মিত নিশ্বাসের শব্দের দিকে কান পেতে জেগেই রইল সারারাত।

কিন্তু রমা কাজে নেমে বুঝল যে, এদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা কত নিরর্থক। ও বস্তুটার প্রয়োজনীয়তা ওরা বোঝে না, সে সম্বন্ধে কোন আগ্রহও নেই। যেন মনে হয় রমার নিজেরই গরজ। বহু চেষ্টা করেও ও তিন চারটির বেশি ছাত্র-ছাত্রী পেলে না। প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে নাইট্‌ স্কুল করার আশা ত ওর শূন্যে মিলিয়ে গেলই—ছোট ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধেও বিশেষ ভরসা পেলে না। যে ক'টি ছাত্র আসে, তারাও প্রকাশ্যে বিড়ি টানতে টানতে আসে। ছ'বছরের ছেলে উলঙ্গ হয়ে ইস্কুলে এল—তারও হাতে বিড়ি, মুখে এক একদিন তাড়ির গন্ধ ছাড়ে।

এধারে ত এই—তার ওপর বিদ্রূপে বিদ্রূপে রমা জর্জরিত হয়ে উঠল। কেউবা প্রকাশ্যে, কেউ গোপনে যা ইঙ্গিত করে তার অর্থ এই

দাঁড়ায় যে, কল্যাণ তাদের এত করে সৎপথে আনার চেষ্টা করে, দুর্নীতি সম্বন্ধে এত বক্তৃতা দেয়, অথচ শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলে না, একটা মেয়ে মানুষ জুটিয়ে আনলে।

রমার মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে এ ইঙ্গিতে—সে নানারকম প্রতিবাদ জানাতে চায়—কিন্তু তার কথা কেউ বিশ্বাসই করে না। নীরব অবিশ্বাসের হাসিতে ওকে আরও অপ্রতিভ, আরও আরক্ত করে তোলে। অত্যন্ত উষ্ণ হয়ে ও মধ্যে মধ্যে নালিশ করে কল্যাণের কাছে, কিন্তু কল্যাণ শুধু মুচকি মুচকি হাসে। বলে 'খোশখবরের ঝুঁটোও ভাল—মন্দ কি!'

রমা যখন খুব রেগে যায় তখন কল্যাণ বলে, 'ওদের কীই বা শিক্ষা, ওরা এর চেয়ে বেশি কী জানে বলো। ওদের ওপর রাগ করা বৃথা।'

রমা তার ইস্কুল সম্বন্ধে মনে মনে হার মানলেও মুখে সে কথা জানাতে পারে না। তাহ'লে ওর এখানে কিছু কাজ থাকে না যে। কিন্তু লক্ষ্য করে যে, তার ক্লাসে না এলেও, মধ্যে মধ্যে কল্যাণ যখন সন্ধ্যাবেলা রামায়ণ মহাভারত থেকে গল্প বলতে বসে তখন বরং বেশ ভিড় হয়—সবাই বেশ মন দিয়ে শোনে। এমন কি মাতালরা পর্যন্ত।

এই পুরুষগুলোকেই রমার ভয় করে। এদের সম্বন্ধে কল্যাণের ধারণাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রোগশীর্ণ, অনাহারে অপুষ্ট, তবু তাড়ি কিংবা পচাই পেটে পড়ার পর এমন হিংস্র এবং বুভুক্ষু দৃষ্টিতে চায় ওরা রমার দিকে যে, ওর রীতিমত গা ছম-ছম করে। তার ওপর সবচেয়ে বিপদ কল্যাণকে নিয়ে—কোথায় কোথায় যে ঘোরে তার ঠিক নেই। প্রতিদিন ভোরে বেরিয়ে যায়, ফেরে দুটো-তিনটেয়। রৌদ্রে ঘুরে যেন ঝল্‌সে আসে—তার ওপর না হয় খাওয়া, না হয় কিছু। আবার আহার সেরেই ও বেরিয়ে পড়ে, রাত দশটা-এগারোটার আগে ফেরে

না। এক এক দিন রাত্রে আসেই না, সেই দিনগুলোই সবচেয়ে ভয় করে রমার। সামান্য একটা আগড় আছে দোরে, ভাল করে বন্ধ করা যায় না,—আর এইত ভাঙা ঘর, একটুখানি আঘাতও সইতে পারবে না বোধ হয়।

আর তেমনি কি হয়েছে কল্যাণ! একটুখানি যত্ন করারও উপায় নেই। ওরই মধ্যে ওর নারী-জাতির সহজাত সংস্কারের বশে, রমা আহারে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করে। কোন দিন বা শাক তোলে বন থেকে, কোন দিন ডুমুর পাড়ে। ডাল সেদ্ধ না খেয়ে ডাল রান্না হয়, তরকারিও হয়। দিন-দুই এই ভাবে যেতেই কল্যাণ সাবধান ক'রে দিলে, 'উঁহু—এর মধ্যে যেন গৃহস্থালির একটা আভাস পাচ্ছি! রান্নাতে তৃপ্ত করার মধ্যে আরামপ্রিয়তা আছে খানিকটা, ওটা কর্মীর সবচেয়ে বড় শত্রু। আরামপ্রিয়তা থেকেই আলস্য আসে। সুতরাং প্রাণ-ধারণের জন্যে যেটুকু দরকার, তার বেশি—'

রাগে ক্ষোভে রমার চোখে জল আসে। সে রুদ্ধ-কণ্ঠে বলে, 'এটা কি তার চেয়ে বেশি হ'ল বলে তোমার মনে হচ্ছে?'

'হচ্ছে বৈকি। এই যে কোথা থেকে একটু তেলও জোগাড় করেছ দেখছি। শাক ভাজলে কিসে? এসব ভাল নয় রমা।'

অগত্যা এ আরামের ব্যবস্থাও বন্ধ করতে হ'ল।

আর একদিন—দুদিন অনুপস্থিত থাকার পর ঠিক বেলা-দুপুরের সময় কল্যাণ ফিরল। ওর দৃষ্টি অবসন্ন, মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। সেদিকে চেয়েই রমা বুঝল ওর খাওয়া হয়নি। বৈশাখের খর রৌদ্র মাঠে অগ্নিবৃষ্টি করছে, তারই মধ্যে দিয়ে অস্নাত উপবাসী লোকটা কত মাইল সাইকেল চালিয়ে এল কে জানে। ও স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গেল নিমেষে, ওর অন্তরের চিরন্তনী নারী সাড়া দিয়ে উঠল।

সে উঠে এসে জোর করে ওর হাত ধরে বসালো, তারপর নিজের আঁচল দিয়ে ওর কপাল গলা মুখের ঘাম মুছে নিয়ে পাখার অভাবে একটা খাতা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। মিনিট-দুই নির্জীবের মত অবসন্নভাবে সে সেবা গ্রহণ করল কল্যাণ, সেটা তখন এত প্রয়োজন যে, নিষেধ করার ক্ষমতা পর্যন্ত ওর ছিল না, তারপর কিন্তু খাতাসুদ্ধ ওর হাতটা চেপে ধরলো। কল্যাণের মুখে একটা প্রচ্ছন্ন-বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছিল। এখন চোখ খুলে হেসে বললে, 'হঠাৎ যেন নর-নারীর আদিম সম্পর্কটা মাথা তুলে দাঁড়াল রমা!—এ রকম ত কথা ছিল না।'

অপমানে, বেদনায় রমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা হ'ল। সে ঝাঁঝের সঙ্গেই জবাব দিলে—'মোটেই না, এটা হ'ল হিউম্যানিটেরিয়ান্ ইন্‌স্টিংক্ট্। যে কেউ থাকলেই করত।'

'না বন্ধু। পুরুষ-বন্ধুরা অন্তত করত না, এটা ঠিক।'

'না তাও করত।' কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলল রমা, 'তোমার বড় সন্দিগ্ধ আর ছোট মন।'

ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছিল। কল্যাণ অপ্রতিভ হয়ে বললে, 'না, তা নয়। তবে কি জানো, এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়েই কর্মীর মনে চিরকালীন নারী জেগে ওঠে। তখন কাজটা যায় পিছিয়ে—রোম্যান্সটা হয়ে ওঠে বড়। রিস্‌ক্ নেবার দরকার কি।'

সুতরাং প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে রাখতে হয় রমার। এক ঘরে বাস করে, মাত্র চার হাত ব্যবধানে রাত্রি কাটায়, তবু স্পর্শ করা ত দূরের কথা, একটু সেবা পর্যন্ত করতে পারে না। অথচ ওর ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে সমস্ত অন্তর রমার আকুলি-বিকুলি করে, তন্দ্রাহীন চোখের পল্লব বেয়ে অশ্রান্তভাবে জল ঝরে পড়তে থাকে।

হঠাৎ একদিন কল্যাণ সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে এল। সেটা আগস্ট

মাস—গুমোট গরমে আকাশ সুদ্ধ যেন ভারী হয়ে আছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে রমার বহু পরিবর্তন হয়েছে—জীবন সম্বন্ধে আশা ও আদর্শ সব কিছু গেছে ওর, তবু কল্যাণকে ছেড়ে ও না পারে নড়তে, না পারে মরতে, এখন শুধু এই অবস্থা। মানসিক জড়তা ও অবসাদে যেন ভেঙে পড়েছে, সেটা কোনমতে কল্যাণের কাছে গোপন রাখে।

তবু কল্যাণকে এমন অসময়ে ফিরতে দেখে ও বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে চাইল, 'কী ব্যাপার, এমন অসময়ে যে!'

কল্যাণ ওর পাশেই বসে পড়ে বললে, 'রমা, সর্বনাশ হয়েছে। গবর্ণমেণ্ট গান্ধীজি, আজাদ, নেহেরু, ওঁদের সব গ্রেপ্তার করেছেন, ফলে চারিদিকে একটা আগুন জ্বলে উঠেছে। জনসাধারণ ত বিপ্লবের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেই, আমাদের কয়েকজন কর্মীও সেই নেশায় মেতে উঠেছে। রজনী, ফণী, ওরা কেউ আর নেই। চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠেছে। আমি চললুম। যদি আর না ফিরি—'

'তার মানে?' অকস্মাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠল রমা।

'মানে, আমাকেও ত গ্রেপ্তার করতে পারে। দীর্ঘদিন কংগ্রেসের নামে কাজ করছি, আমাকেও ঐ দলে ফেলা আশ্চর্য নয়। তাহ'লে তুমি যেমন করে পারো কলকাতায় ফিরে যেয়ো। এখানে থাকা তোমার নিরাপদ নয় রমা—আমি আছি বলে এরা চুপ করে আছে, ওরা আমাকেই ভয় করে।'

অভিভূত আচ্ছন্নের মত রমা বললে, 'তারপর?'

'তারপর আর জানি না। অত ভবিষ্যৎ কখনও ভাবিনি। যা উচিত মনে হয় তাই ক'রো। আমি চললুম।'

'কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ?' আকুল হয়ে প্রশ্ন করে রমা।

'আমি যাচ্ছি ওদের ফেরাতে। এ আমাদের আদর্শ নয়—এতে

আমাদেরই সর্বনাশ হবে—এইটেই বোঝাতে চেষ্টা করব ওদের—না হয় প্রাণ দিয়েও বাধা দেব।'

আর কোন প্রশ্ন ওঠবার আগেই কল্যাণের সাইকেল দূর মাঠের পথে মিলিয়ে গেল।

সারারাত উদ্বিগ্ন মুখে সেই অন্ধকারেই মাঠের দিকে চেয়ে বসে রইল রমা, কিছু দেখা যায় না, তবু প্রাণপণে চেয়ে থাকে। ওর ভেতরটা ত পাথর হয়ে গিয়েছিলই, বাইরেও যেন আজ আর কোন সাড়া নেই।···

একেবারে ভোরের দিকে দূরে কাদের দেখা গেল বিন্দুর মত।

ক্রমে ক্রমে সেই বিন্দুগুলো বড় হয়ে উঠল।

হ্যাঁ, মানুষই, অনেকগুলো মানুষ। কা'কে যেন বয়ে নিয়ে আসছে। আর আসছে এ দিকেই।

সর্বনাশের পূর্বাভাস জেগেছিল রমার রক্তের মধ্যে, জেগেছিল ওর নিশ্বাসে। তবু ও ছুটে গেল।

ঝুলিয়ে আনছে ওরা কল্যাণকেই। সদর কলেক্টরির আগুন নেভাতে গিয়ে ভুল-ক্রমে পুলিশের হাতেই গুলি খেয়েছে, তারা অন্ধকারে বুঝতে পারেনি। চিন্তার কোন কারণ নেই, ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে। গুলিটা বার করে দিলেই—

কল্যাণ চোখ চাইলে যখন, তখন প্রথমেই চোখে পড়ল রমার মুখ ঝুঁকে আছে ওর মুখের দিকে। অনিমেষ বজ্রাহত দৃষ্টি। আজ আর তার কোন সঙ্কোচ নেই, রুক্ষ চুলের রাশির মধ্যে আঙুল চালিয়ে জটগুলো শিথিল করবার চেষ্টা করছে সে, মাথাটা তুলে নিয়েছে নিজের কোলের ওপর।

কল্যাণ একটু হাসল। জড়িয়ে জড়িয়ে থেমে থেমে বললে, 'রমা, ভয় পেয়েছ, না? তুমি বড় অসহায় হয়ে পড়লে! কিন্তু তুমি নিশ্চয়

বাড়ি ফিরে যেয়ো। বাবা নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন, তুমি ত কোন ছোট কাজ করনি। পারো ত বিয়ে করে সুখী হয়ো।…আমি বড় স্বার্থপর রমা—নিজের জন্যই তোমাকে এত দুঃখ দিলুম, হয়ত বা তোমার জীবনটাই নষ্ট করে দিলুম।…আমি জানতুম যে এখানে তোমার দ্বারা কোন কাজ হবে না, এখানে তুমি আসছ আমার জন্যই, তবু তোমাকে টেনে এনেছিলুম।—কেন, জান রমা?'

ভোরের আলোয় ওর বিবর্ণ রক্তহীন মুখের সেই একঝলক রক্তাভা পরিষ্কার দেখা গেল। সে আরও চুপি চুপি বললে, 'আজ আর লজ্জা করব না, স্বীকার করেই যাই,—আমিও তোমার সাহচর্য কামনা করেছিলুম মনের অবচেতনে। কঠোর হয়েছি, তপস্যা করেছি, তবু তোমাকে ভুলতে পারিনি রমা, কাছে রাখবার লোভও সামলাতে পারিনি।…ঈশ্বর আজ বোধ হয় সেই শাস্তিই দিলেন।'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে শ্রান্ত কল্যাণ চুপ করে রইল অনেকক্ষণ।

কে যেন বললে কোথায়, 'ডাক্তার কেন এল না এখনো?'

আর একজন তার উত্তর দিলে, 'তিন মাইল পথ যাবে, খবর দেবে, তবে ত তিনি আসবেন—!'

কল্যাণ আবারও চুপি চুপি বললে, 'বাড়িতে ফিরে যেয়ো রমা, জীবনটা নষ্ট ক'রো না।'

তারপর যেন গভীর ক্লান্তিতেই ওর চোখের পাতা বুজে এল।

কে জানে এ ঘুম কিনা। নিশ্বাসের শব্দও যেন আর পাওয়া যাচ্ছে না।

ডাক্তারবাবু তখনও এসে পৌছননি।

অনুচ্ছেদ

আগে হ'লে ওর চোখে জল আসত, এখন শুধু হাসি পায়। বাস্তবিক, রাগ, ক্ষোভ, অভিমান—এসব স্তর ত সে কবেই পার হয়ে চলে এসেছে। এখন অদৃষ্টের এই বিড়ম্বনায় আর কোন উষ্ণ অনুভূতিই বোধ করে না, কৌতুক ছাড়া। আর এমনিতেও—না হেসে উপায় কি? ঐ যে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেগুলো তাকে দেখে বিদ্রূপ করে, শীষ্ দেয়, ওরা কি এর অর্থ বোঝে, না তার ইতিহাসের গুরুত্বটা তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব? ওরা ত শুনেই শিখেছে, হয়ত গুরুজনদের দেখেও—

অমিয়া বিছানায় শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ ধরে এপাশ-ওপাশ করছে। হাসি পাবারই কথা, মনে মনে সে হাসবার চেষ্টাও করলে, এমন কি ওর বিশ্বাস যে, সে হাসছেই, তবু কখন্ যে নিঃশব্দে কয়েক ফোঁটা জল চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে ওর বালিশ ভিজিয়েছে তা টেরও পায়নি— হঠাৎ পাশ ফেরবার সময় ভিজে বালিশের স্পর্শ-টি পেয়ে চম্‌কে উঠে আসল ব্যাপারটা লক্ষ্য করলে।

ছি ছি, এ কী দুর্বলতা! আসলে সমীরও ত সেই পুরুষই, যে পুরুষকে সে অহরহ তার পাশে দেখছে, যে পুরুষ তাকে সম্ভোগের আশায় লালাসিক্ত মুখে সর্বদা তার চারিদিক ঘিরে চাটুবাদের গুঞ্জন করে চলেছে। সাধারণ বলিষ্ঠ যে পুরুষ, যারা স্ত্রীর দ্বারা নিজেদের তৃষা পরিতৃপ্ত হবার সুযোগ না ঘট্‌লে বাইরে যায়—সে স্তরেরও জীব এরা নয়; এরা পশুর চেয়েও নীচ, নির্বোধ পশু মাত্র। তবে, এমন কী সর্বনাশ তার হয়ে গেল যে, চোখে জল আসছে?

আর এ সম্ভাবনা ত জানাই ছিল আগে। আগুনে যখন হাত

দিয়েছে তখন ত সে জানেই যে তার হাতে ফোস্কা পড়বে। বৃথা পশ্চাত্তাপে কাজ কি ?

অমিয়া বিছানার ওপর উঠে বসল। মাথার শিয়রে একট সঙ্কীর্ণ ছোট্ট জানলা, তারই মধ্য দিয়ে একটুখানি মুক্ত প্রকৃতির পরশ, একফালি মাত্র আকাশ—এইটুকু তার সান্ত্বনা। প্রায় প্রতি রাত্রেই ওর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক এবং অপমানতপ্ত কপোলকে শান্ত ও শীতল করার আশায় এই জানলাটির দুটি মাত্র লোহার শিকে মাথা চেপে ধরতে হয়। বহুদিন হ'ল বৈকি, তবু ত এখনও তার এ অপমান-বোধ গেল না। এখনও ত তেমনি বিষদাহে জ্বলতে থাকে তার দেহ, ঐ ভণ্ড কাম-সর্বস্ব লোক-গুলোর আলিঙ্গনের মধ্যে।

অথচ, উপায়ই বা ছিল কী ?

তারা ব্রাহ্মণ বটে, ভদ্রলোকও বটে—কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব এবং ভদ্রতা বজায় রাখার জন্য যে বস্তুটির সবচেয়ে প্রয়োজন, তার অভাব ছিল বলেই আজ আর তারা কিছু নয়। আজ পাড়ায় নিন্দা ও উপহাসের গুঞ্জনের মধ্যে যে শব্দটা প্রায়ই তার কানে যায়, সেইটেই বোধ হয় তাদের সত্য পরিচয়ের সবচেয়ে কাছাকাছি শব্দ—'হাফ গেরস্ত !' ওরা এমন কিছু মিছে কথা বলে না। শব্দটার সঙ্গে যে অপরিসীম ঘৃণা জড়িয়ে আছে, আজ তাও ত তাদের প্রাপ্যই।

বাবা চাকরি করতেন কোন এক বাঙালী-বাড়ির মার্চেণ্ট অফিসে—অর্থাৎ একটু বড় রকমের দোকানে। নিজে বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না বলে মাইনে বেশি হয়নি। ষাট বছর বয়সে ষাট টাকা, সেইজন্যেই ছেলেমেয়েদেরও লেখাপড়া শেখাতে পারেননি। বাবা, মা, অমিয়া নিজে আর দুটি ছোট ছোট ভাই। তখনকার দিন বলেই কোনমতে

গ্রাসাচ্ছাদন চালানো সম্ভব হয়েছিল—ছোট ভাই দুটো ক'দিন ইস্কুলেও গিয়েছিল, কিন্তু তার ইস্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শেখার কথা কেউ সেদিন কল্পনাও করেনি। অমিয়ার নিজের খুব বেশি রকমের চাড় ছিল বলে মোটামুটি বাংলা লেখাপড়া কিছু কিছু শিখেছিল বাবার কাছে; ইংরেজীও শিখেছিল ওদের পাশের বাড়ির অজিতদার কাছে, তার অবসর মত ছুটির মধ্যাহ্নে বা অন্যদিনের সন্ধ্যায়; এমন কি, সে অধ্যাপনার দক্ষিণা-স্বরূপ ওর কৌমার্য প্রথম তার কাছেই ডালি দিতে হয়েছিল, তবু সে লেখাপড়াটা ছাড়তে পারেনি। কিন্তু তাও বেশি দূর এগোতে পারলে না। অজিতদা চাকরি নিয়ে চলে গেল আসামে, খান চার-পাঁচ পাঠ্য-পুস্তক পড়েই ওর ইংরেজী শেখার বাসনা ত্যাগ করতে হ'ল।

ওর পরের যে ভাইটি, তাকে প্রাইমারী ইস্কুলেই ও-পাঠ শেষ করতে হয়েছিল। সে আর পড়তে চেষ্টাও করেনি—এখন কোন্ কারখানায় চাকরি করে আর গাঁজাগুলি খেয়ে ঘুরে বেড়ায়; ছোট ভাইটাও মাইনর ইস্কুলে প'ড়ে দু বছর চুপ করে বসে ছিল—এখন অমিয়া আবার তাকে পড়াচ্ছে। ম্যাট্রিক পাস করে সে পড়তে গেছে সুদূর নাগপুরে, যেখানে ওদের এই গ্লানির সংবাদ পৌঁছবে না হয় ত! অন্তত সেই আশাই সে করে। তবু যদি একটাও মানুষ হয় ত হোক্।

বাবার ওরা দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান—বৃদ্ধবয়সের। পার্বতীবাবুকে যখন ষাট বছর বয়সে সায়াটিকার জন্য বাধ্য হয়ে চাকরি ছেড়ে ঘরে এসে বসতে হ'ল, তখন ওদের কীই বা বয়স। ওর পনেরো—ভাইরা একজন দশ, একজন ছয়। তবু ত ওর বড়দির এই বাড়িটা পেয়েছিল। মাথার ওপর একটা আশ্রয়ও ছিল না সেদিন—একতলার একটা ঘর, তের টাকা ভাড়া দিতে হ'ত তার, তাও প্রায় আট মাসের ভাড়া বাকি পড়েছিল—ওর বড়দি হ'ল ওর বৈমাত্র বড় বোন—বাবার প্রথম পক্ষের একমাত্র

সন্তান, সাতটি মৃত সন্তান প্রসব করার পর ঐ অনিলাকে রেখেই তার বড় মা মারা যান। অনিলা দেখতে সুশ্রীই ছিল তবু পার্বতীবাবু তাকে ভাল বিয়ে দিতে পারেননি। অনিলার বাবার চেয়ে সতেরো বছরের বড় এক পাত্রের সঙ্গে তৃতীয় পক্ষে ওর বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের বছর-তিনেক পরেই অনিলা বিধবা হ'ল—পাছে ওর স্বামীর অন্য আত্মীয়-স্বজনরা এসে বাড়িতে চেপে বসে এই ভয়ে অনিলা ওদের নিয়ে এল এখানে। বিয়ের আগে পার্বতীবাবু বুদ্ধি করে ভাগ্যিস এই বাড়িটা অনিলার নামে লিখিয়ে নিয়েছিলেন—সতীনপোরা বাকি জমি-জমার একটা টুক্‌রোও দিলে না ওকে। বাড়িটা অবশ্য খুবই ছোট, মোটে দুটো ঘর, কিন্তু কাঠা-পাঁচেক জমি আছে এর সঙ্গে। তার দাম যতই হোক—ভাড়া দিয়ে আয় করা সম্ভব হয়নি তা থেকে। কলকাতার উপকণ্ঠে বাড়িটা পাওয়ায় সেদিন ওর বাবার সুবিধাই হয়েছিল, এখান থেকে চাকরি করতে পারতেন—আর বলেও ছিলেন তাই, যে, ঘরের ভাড়াটা মাসে মাসে তিনি অনিলাকেই দেবেন।

কিন্তু এখানে আসার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই চাকরি গেল। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ছিল না, বাবুরা দয়া করে ছ'মাসের মাইনে দিয়েছিলেন তবু। আর কিছুই ছিল না—সুতরাং ছমাসের টাকাতে একবছর চালিয়ে শুরু হ'ল উপবাস। ওর মায়ের গহনাতেই অনিলার বিয়ে হয়েছিল, অনিলা তার একটিও হাতছাড়া করতে রাজি হ'ল না। বিমাতা বা তার ছেলে-মেয়েদের প্রতি সাধারণত যে বিদ্বেষ থাকে তা ওর ছিল না, কিন্তু তাই বলে ওর ইহকালের সম্বল ঐ গহনাগুলো বেচে তাদের খাওয়াতে সে যদি রাজি না হয়ে থাকে ত তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তা ছাড়া অনিলা রইল না বেশি দিন। ওর রূপ এবং ভরা-যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই এসেছিল ওর কাছে পাপের গলিপথ দিয়ে, প্রাণপণে তাদের

ক্লেদাক্ত সাহচর্য থেকে নিজেকে দীর্ঘকাল রক্ষা করেও সে পারল না। শেষ পর্যন্ত এক রাজমিস্ত্রির সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে টালিগঞ্জে বাস করছে এখন। বাড়ি তারই, সে দাবী সে ছাড়েনি—শুধু দয়া করে বাস করতে দিয়েছে ওদের—পাছে ওরা অভাবে পড়ে ট্যাক্স বা খাজনা দেওয়া বন্ধ ক'রে বাড়ি নিলামে চড়ায় এই ভয়ে সেগুলো সে সেখান থেকেই দেয়। অন্তত সে দায়ে ওরা নিশ্চিন্ত।

তবু—আহার ও আচ্ছাদনের বড় সমস্যাটাই থেকে যায় বৈকি!

আফিমখোর বাবার দুধ চাই, চা চাই, একটু মিষ্টি চাই। বুড়ো বয়সে যেমন আরামপ্রিয় তেমনি অবুঝ হয়ে পড়েছেন। রোজগার করেন না, অথচ এগুলো কোথা থেকে আসবে তা একবারও ভাবেন না। মার শরীর অশক্ত, তিনি চিন্তাও করতে পারেন না—শুধু অভাবের তাড়নায় মধ্যে মধ্যে হাউ হাউ ক'রে কাঁদেন আর মাথা কোটেন। ভায়েরা বলে 'ভাত দাও!' বলে 'খিদে পেয়েছে'—এই অবস্থায়,ষোল-সতের বছর মাত্র বয়সে—সমস্ত সমস্যা সমাধানের ভার, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব যেন এসে পড়ে ওরই ওপর।

অথচ, যে সব গুণ থাকলে এ ভার নেওয়া চলত তার একটাও ওর ছিল না। লেখাপড়াই শেখেনি সে—গান-বাজনা ত দূরের কথা। চাকরি করবে কিংবা টিউশ্যনি করবে সে সম্ভাবনা ছিল না সেদিন। ওর বাবা ওর বিয়ে দিয়ে ফেলবার একটা ক্ষীণ চেষ্টাও করেছিলেন কিছুকাল; কিন্তু সাধারণ চেহারার শ্যামবর্ণের মেয়ে, হয়ত কষ্ট করে উজ্জ্বল-শ্যামও বলা যায় তাকে, কিন্তু ফরসা কোন রকমেই নয়—তার অবৈধ প্রণয়ের বাজারে যদি বা কিছু দাম থাকে, বিয়ের বাজারে এমন কোন দাম নেই যাতে বিনা পয়সায় হয়ত-বা ঘর থেকে কিছু দিয়ে ওকে কেউ বিয়ে করতে পারে। তা ছাড়া, যদিই বা কোন সুদূর সম্ভাবনা থাকত, ওর

দিদির কাহিনীটা তা একেবারেই নষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং পথ সেদিন কোথাও খোলা ছিল না কোনদিকে।

অবশ্য, হ্যাঁ—পাড়ার গৃহিণীরা ওদের জানালার দিকে মুখ ক'রে মধ্যে মধ্যে উচ্চকণ্ঠে দুটো উপায় বাত্‌লান বটে—'এর চেয়ে ঝি-গিরি করে খেলি না কেন, লোকের বাড়ি বাসন মেজে খাওয়াও যে এর চাইতে ঢের ভাল ছিল!' কিংবা 'বুড়ো বাপের হাত ধরে ভিক্ষে করলে আর-যাই-হোক্ ধর্মটা বাঁচত, নিজের ইজ্জৎটা থাকত! ছি ছি, ভাল খাবার. ভাল পরবার এত সাধ? সাধে আগুন লেগে যাক্। অমন আরামের মুখে মারি ঝাড়ু!'

ধর্ম-টা তাতে বাঁচত হয়ত, কিন্তু প্রাণটা বাঁচত না। ঝি-গিরি করে অত বড় সংসার প্রতিপালন করার কথা সে ভাবতেও পারেনি। তাছাড়া ওর যে বয়স তখন, সংসারের শতকরা নব্বইটা পুরুষ যে বয়সের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—সে বয়সে ঝি-গিরি করতে গেলেই কি ধর্মটা বাঁচত? না, ঐসব গিন্নিরাই সেদিন ভরসা ক'রে ওকে ঝি-গিরি করতে দিতেন? আর ভিক্ষে করার কথাও সে চিন্তা যে না করেছে তা নয়, কিন্তু একটা পয়সা কেউ সহজে দিতে চায় না কাউকে। বিশেষত যখন পয়সার বিনিময়ে তার কাছ থেকে নেবার অন্য জিনিস রয়েছে। যারা আজ ভাল ভাল শাড়ি এনে দিচ্ছে এক কথায়—তারা কেউ ওদের দুর্দিনে চার পয়সাও সাহায্য করতে চায়নি।

না, এ পথ থেকে অব্যাহতি পাবার, এ অপমান থেকে নিষ্কৃতি পাবার অন্য কোন উপায় ছিল না সেদিন। কঠোর কায়িক পরিশ্রম করেও ভায়েদের লেখাপড়া শেখানো যেত না, মায়ের রোগে চিকিৎসা হ'ত না, বাবা বেচারী চায়ের সঙ্গে একটু দুধ পেত না—এমন কি একবেলা পেটভরে ভাত খাওয়াই হয়ত দুষ্কর হয়ে উঠত। কী এমন

কাজ করতে পারত সে? একটা ঝিয়ের মাইনে এ যুদ্ধের আগে কতই বা ছিল? তা ছাড়া—এই ত দেশ ও সমাজের অবস্থা! ধর্ম কী, ইজ্জৎ কী ভাল করে জানবার কিংবা বোঝবার বহু আগেই ত তা শিক্ষিত ভদ্রসন্তান অজিতদার কাছে নিঃশেষ করে দিয়ে আসতে হ'ল! সেদিনও সত্যিই কিছু বোঝেনি, বিস্মিত বিহ্বলভাবে তার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছিল, বাধা দেবার যে কারণ আছে, তাও সেদিন ভাল করে ওর জানা ছিল না। লজ্জা, ভয়, কৌতূহল, বিস্ময়—অনেকগুলো অনুভূতি তাকে সেই স্বল্প সময়ের জন্য জড় করে দিয়েছিল। অজিতদার প্রতি শ্রদ্ধাও ওর কম ছিল না—পাড়ার সবাই তাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখত; ভাল ছেলে, স্কলারশিপ পেয়ে পাস করে—আর-পাঁচজনের মতই এ খ্যাতির চটকে সে-ও সেদিন অভিভূত বোধ করত নিজেকে ওর সামনে।

আর সব চেয়ে বড় কথা—এত ভালমন্দ নিয়ে চিন্তা করবার অবসরই বা ছিল কোথায় সেদিন? একদিকে উপবাস, একদিকে মৃত্যু—আর একদিকে অনায়াসমুক্ত এই পথ। এ পথ সেদিন সত্যই ওর সামনে আপনি খুলে গিয়েছিল, প্রস্তাব এবং প্রস্তাবকের অভাব ছিল না। যে-সব প্রতিবেশী দুর্দিনে কোন সাহায্য করেননি, যাঁদের অবজ্ঞা এবং ধিক্কারে আজ ওর চারিপাশের আকাশ-বাতাস বিষাক্ত, তাঁদেরই বাড়ির ছেলেরা ওকে পূজো করেছে, ওর পায়ের কাছে প্রণামী এনে পৌঁছে দিয়েছে নিঃশব্দে এবং সসঙ্কোচে। অন্নবস্ত্র শুধু নয়—বিলাসের উপ-করণেরও অভাব ঘটেনি।

এর পর দ্রুত উৎরাই ছাড়া আর পথ ছিল না। তবে একটা কথা ও সেই বয়সেই বুঝেছিল যে, খোলাখুলি যৌবনের বেসাতিতে ওর দাম সে পেত না—যতটা এতে পেয়েছে। ওর গায়ের চামড়া ফরসা নয়, চোখমুখেও অত শ্রী নেই, অতি সাধারণ চেহারা—বাজারে যার

কিছুমাত্র অভাব নেই। শুধু যে সে ভদ্রঘরের কুমারী মেয়ে, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, এই পরিচয়টাই যেন ওকে একটা শ্রী এনে দিয়েছে। এপথে এসে দেখলে যে, এমন বহু উন্মাদ আছে যারা এই গৌরবটার জন্যই ব্যস্ত। যারা এম্‌নি প্রণয় করার অবসর বা সুযোগ পায়নি তারা এই মিথ্যা সান্ত্বনাকেই আঁক্‌ড়ে ধরে। একবার একজনের কাছ থেকে প্রস্তাব এসেছিল যে, সে যদি একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে লেকের ধারে হাত ধরাধরি করে শুধু বেড়াতে রাজি থাকে তাহ'লে সে তাকে মাসে একশ' টাকা দেবে। তাও রোজ নয়—সপ্তাহে তিন বা চার দিন।

ক্রমে আর একটা বৃত্তিও তার কাছে এগিয়ে এল—অবশ্য এই পথ ধরেই। সেটা অভিনয়ের। ফিল্‌মে অভিনয় করার ব্যবস্থা, ওর এই পথেরই এক 'বন্ধু' করে দিলেন। ওর নায়িকা সাজার মত চেহারা বা দক্ষতা ছিল না বটে, কিন্তু ভদ্রমহিলাকে ছবিতে নামাবার জন্য ব্যস্ত, এমন ডিরেক্‌টারের অভাব নেই। ছোটখাট ভূমিকার জন্যই প্রচুর টাকা পেতে লাগল সে। অবশ্য তার আগে তাকে লাঞ্ছনাও কম সইতে হয়নি। মাগো, দাঁড়কাককে কত ময়ূরপুচ্ছই না গুঁজতে হয়েছে পিছনে! যে শিক্ষা সে পায়নি—যার কিছুই সে জানে না, সেই উচ্চ-শিক্ষা যাঁরা পেয়ে থাকেন, শিক্ষা ছাড়া তাঁদের কাছ থেকে সব কিছুই সে নিয়েছে। সেই ধরণে কাপড় পরা, সেই রকম বেশভূষা; সেই রকম কেশ-সজ্জা—এমন কি হাতে একখানা বই বা খাতা নিয়ে চলাফেরা করা—আত্মাবমাননাকর কোন অভিনয়ই সে বাদ দেয়নি। প্রয়োজনই এসব শিখিয়েছে তাকে ক্রমশ, এপথের যারা খরিদ্দার তারা যে এই চায়! যায়, বন্ধুদের কল্যাণে, ইংরেজী বুখ্‌নিরও ওর অভাব ছিল না। আধুনিক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ের মুখের হাসি, দৃষ্টির প্রসাদের দাম আছে বৈ কি! ক্রমশ এই শিক্ষাটাও পেয়েছিল, যে নিজেকে যত

দুর্লভ করবে, তার তত বেশি মূল্য মিলবে—যত যে সুদূর তার তত দাম। ইদানীং নিজেকে একটা কৃত্রিম রহস্যে ঢেকে রাখার কৌশলও সে আয়ত্ত করেছে, প্রশ্ন কি-ক'রে এড়িয়ে যেতে হয় মিষ্টি হাসি দিয়ে, তার বিজ্ঞান ওর কাছে আজ দুই আর দুই যোগ করার মতই সহজ।

কিন্তু এই কলাকৌশল এবং বিজ্ঞানসাধনার পরম মূল্য পাবার যখন সময় হ'ল তখন সে তা কিছুতেই হাত পেতে নিতে পারলে না। এতদিনের সমস্ত শিক্ষাই মিথ্যা হয়ে গেল, সত্য হয়ে রইল ওর ভদ্র মন এবং বংশপরম্পরার সংস্কার ও শিক্ষা। নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎ ও নিজে হাতে ভেঙে দিয়ে এল এইমাত্র—নিজের অপমৃত্যুর এই অন্ধ কারাগার থেকে বার হবার রাস্তা নিজে বন্ধ করে দিলে।

সমীর বড়লোকের ছেলে, নতুন এসেছে এ পথে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি আছে, সৌখীন ব্যবসায়ের দিকে ঝোঁক। পরামর্শ দিয়ে এপথে নামাবার মত হিতাকাঙ্ক্ষীর অভাব ছিল না। অগাধ পয়সা নিয়ে সে নেমেছে এমন ব্যবসায়, যে ব্যবসার সে কিছুই জানে না—ফলে টাকা উড়ে যাচ্ছে পাখা মেলে, কখনও ফিরবে সে আশা সুদূরপরাহত।

প্রথম সমীরের সঙ্গে ওর আলাপের ইতিহাসটা আজও অমিয়ার মনে আছে স্পষ্ট। চন্দ্রপুরী স্টুডিওতে কী একটা ছবি উঠছে, তাতে ওর কাজ কম কিন্তু হাজিরা দিতে হয় প্রত্যহ। সমীর এসেছে তার ডিরেক্টার সঙ্গে করে শিল্পীদের সঙ্গে চুক্তি করতে। কে যেন সমীরকে নিয়ে এসে আলাপ করিয়ে দিলে। সমীর প্রথম আলাপের পর খুব সবিনয়ে বললে, 'আপনি আসুন না এ ছবিটাতে, আসবেন দয়া করে?'

অমিয়া ওর সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। ভদ্র কণ্ঠস্বর,

লাম্পট্যের ছাপ আজও ওর সুন্দর মুখশ্রীকে ম্লান করেনি, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল আশায় জ্বলছে। দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত যেমন সুকুমার তেমনি ভদ্র। অল্প বয়স, তেইশ চব্বিশের বেশি নয়—সবে কলেজ ছেড়েছে। ওকে দেখে অমিয়ার হঠাৎ যেন বড় মায়া হ'ল। সে ঘাড় নেড়ে বললে, 'না। আমাকে মাপ করুন।'

নিমেষে সমীরের মুখ ম্লান হয়ে গেল। সে বললে, 'কেন বলুন ত? এলে খুব ভাল হ'ত কিন্তু—আপনার অন্য এনগেজমেণ্ট বাঁচিয়ে যদি ব্যবস্থা করতে পারি?'

অমিয়া বললে, 'জানেন ত, যারা মাংস-রসিক তারা কচি পাঁঠা খায় না—পাকা খাসী পছন্দ করে। আপনার কাঁচা-মাথায় আমার লোভ নেই। আপনি যান।'

ওর এই আকস্মিক রূঢ়তায় উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। সমীর লাল হয়ে উঠল কিন্তু হঠাৎ কোন জবাব খুঁজে পেলে না। ওর ডিরেক্টার ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'আপনার এ মন্তব্যের অর্থ? যদি কিছু মনে না করেন অবশ্য—'

অমিয়া ওর শান্ত দৃষ্টি তাঁর মুখের উপর নিবদ্ধ ক'রে বললে, 'অর্থ ত বুঝতেই পারেন। ওঁর কাঁচা মাথাটি খাবার জন্যই ত আপনাদের এই আয়োজন—তার মধ্যে আর আমি যেতে চাই না।'

তারপর ক্রুদ্ধ ডিরেক্টারকে আর কোন উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে একেবারে তাঁর দিকে পিছন ফিরে ও ঘুরে দাঁড়াল সমীরের মুখোমুখি, স্পষ্টকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, 'আপনি কী করতে নেমেছেন এ ব্যবসায়ে? কী অভিজ্ঞতা আছে আপনার? সব প্রোফেশনই শেখবার দরকার হয়, আর ব্যবসাটা বুঝি এতই সহজ? বিশেষত এই ব্যবসা? আপনার চেয়ে বহু ঘুঘু লোক এ ব্যবসা থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে বেরিয়ে গেল, আর

আপনি এমনি বা কি বুদ্ধিমান যে এসেছেন লাভ করতে ? ক'টা লোক এ ব্যবসা করে বড়লোক হ'ল দেখাতে পারেন ? পয়সা হচ্ছে আমাদের, এই সব ডিরেক্টারদের, মাইনেকরা কর্মচারীদের। মালিকদের কী হচ্ছে ? যান, বাড়ি ফিরে যান, পয়সা বেশি হয়ে থাকে, সৎ পাত্র দেখে দান করুন গে ; একটা হাসপাতাল করে দিন, তবু নাম থাকবে।'

এই বলে, আর কোন বাদানুবাদের অবসর না দিয়ে, কোন সম্ভাষণ পর্যন্ত না করে, সে চলে গিয়েছিল সেদিন।

কিন্তু ফল হয়েছিল ঠিক উল্‌টো। সমীর এ ব্যবসার মোহ ছাড়তে পারেনি এবং অমিয়াকেও বহু সাধ্য-সাধনা ও মোটা টাকার অঙ্গীকারে ওর ছবির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। এর পর ওদের বন্ধুত্বটা যে কি-ক'রে এমন দ্রুত জমে উঠল সেটা আজও অমিয়ার কাছে যেন বিস্ময়। সমীর ওকেই একমাত্র আশ্রয় বলে অবলম্বন করেছে। এই হৃদয়হীন স্টুডিও-মরুতে অমিয়াকেই মনে হয়েছে একমাত্র ওয়েসিস্, একমাত্র সহৃদয় ব্যক্তি। এটা যে অমিয়ার একটা কৌশল মাত্র—সেটা বোঝাবার লোকের অবশ্য অভাব ছিল না, কিন্তু সমীর তা বিশ্বাস করতে পারেনি। অল্প বয়স, রোমান্টিক মন ওর—অমিয়ার মধ্যে সে তার সত্যকার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকেই খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছে।

আর সেইখানেই হয়েছে অমিয়ারও মুস্কিল। এমনভাবে এতখানি ধনী এবং মালিক শ্রেণীর একজনের প্রসন্ন দৃষ্টি পাওয়ার সুযোগ এর আগে কখনও ঘটেনি, অন্য এই শ্রেণীর বন্ধুদের মত শুধু যদি তা দৈহিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যেত তা'হলে অমিয়ার সঙ্কোচ থাকত না, সে স্বচ্ছন্দে নিজের ভবিষ্যতের সংস্থান করে নিতে পারত। কিন্তু সমীরের চোখে দেখেছে সে সম্ভ্রমের দৃষ্টি, দেখেছে উচ্চধারণার আলো,—সেটুকু আজ সে কিছুতে খোয়াতে রাজি নয়। ছোট সে কিছুতেই হতে

পারবে না ওর সামনে। অথচ যতই সে নিজেকে সংযত করে, সংবরণ করে নিজের লোভ, ততই সমীরের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ বাড়ে। সুন্দরীর অভাব নেই ওখানে, সমীরের প্রসাদ পাবার জন্য তাদের অনেকেই ব্যগ্র, কিন্তু সমীরের সমস্ত মন ক্রমশ যেন একাগ্র হয়ে ওঠে এই অতি সাধারণ চেহারার মেয়েটির দিকেই। অমিয়া তা না পারে গ্রহণ করতে, আর না পারে উপেক্ষা করতে।

এমনি ক'রে বহুকাল ধরে যে মেঘ জমছিল আজ তা অবশেষে বজ্রনিক্ষেপ করল ওর জীবনে। এর জন্য অমিয়া যে প্রস্তুত ছিল না তা নয়, তবু এ আঘাতটা যে এত প্রচণ্ড হবে তা ও ভাবেনি।

কী একটা ব্যাপারে সমীর ওর উপদেশ শুনে সম্প্রতি হাজার-কয়েক টাকা খরচা বাঁচিয়েছিল; সেই কৃতজ্ঞতা নিবেদনেরই সুযোগে, অকস্মাৎ কোনরকম ভূমিকা না করে, ওকে প্রস্তুতির বিন্দুমাত্র অবকাশ না দিয়ে, সমীর বলে ফেলল, 'একটা কথা বলব অমিয়া?'

সমীরের কণ্ঠস্বরটা হয়ত সামান্য কেঁপেছিল। অমিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। বললে, 'বলো।'

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে? না বোলো না লক্ষ্মীটি, ক'দিন দিনরাত শুধু ভেবেছি কি-ক'রে কথাটা পাড়ব, ইতস্তত করেছি শুধু এই ভয়ে পাছে তুমি রাজি না হও। আমার এখন এই একমাত্র স্বপ্ন।'

অমিয়া আর আগেকার অমিয়া নেই, স্টুডিওতে এসে কথা বলতে শিখেছে, ক্ষুরধার রসনা তার দ্রুত জবাবের জন্য বিখ্যাত। তবু আজ তার কণ্ঠে কোন স্বর ফুটল না—হতভম্ভ, বিহ্বল দৃষ্টিতে সে ওর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুকাল।

সমীর ব্যগ্র, ব্যাকুল ভাবে কিছুকাল তাকিয়ে থেকে বললে, 'তা'হলে তুমি রাজি ত?'

এইবার অমিয়া কথা কইলে। স্খলিত আঁচল যেমন শ্রান্ত হাতে ধীরে ধীরে টেনে নেয়, তেমনি ভাবেই ও নিজের ছড়িয়ে পড়া, খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়া বুদ্ধিবৃত্তিটাকে সংহৃত করে নিলে। কম্পিত কণ্ঠে বিদ্রূপ এনে বললে, 'ভাবছি, আপনার স্বপ্নটা বেশ ত! এইজন্যই কি আপনার এ ব্যবসায়ে নামা? এখানে এসেছেন ক'নের খোঁজে? সংসারে অভাব কি ছিল?'

সমীরের সুন্দর প্রশান্ত ললাটে ঘাম দেখা দিয়েছিল। সেদিকে চেয়ে অমিয়া বুঝি সঙ্কল্প আর ঠিক রাখতে পারে না। সমীর অধীরভাবে চুলগুলো ভিজে কপাল থেকে সরিয়ে বললে, 'অমিয়া, এ সময়ে অন্তত তোমার বিদ্রূপটা রাখো। জীবনে এ একটা মহামুহূর্ত—এমন অবসর হয়ত একবারই আসে। মানুষের সারা-জীবনের সুখদুঃখ যে ঘটনার উপর নির্ভর করে—তার কি স্থান-কাল-পাত্র আছে?'

'মহামুহূর্ত!' অমিয়ার চোখ জ্বলে ওঠে, 'কার মহামুহূর্ত কখন্ আসে কখন্ যায়, আপনি তার কী খবর রাখেন? নিজেকে অত দাম দিচ্ছেন কেন? আপনার জীবনের কোন্‌টা পরমলগ্ন কিংবা মহামুহূর্ত তা জেনে আমার লাভ কী? আর তার জন্য আমায় গম্ভীর হয়ে, নিশ্বাসরোধ করে বসে থাকতে হবে কেন?'

সমীর বেচারী যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়। সে শুষ্ক কণ্ঠে বলে, 'তবে কি আমি বুঝব আমার সুখদুঃখ, আমার ভবিষ্যতের কোন মূল্যই নেই তোমার কাছে? এতকাল কি আগাগোড়া ভুল বুঝেছিলুম?'

ওর অসহায় মুখের দিকে চেয়ে মায়া হয় বৈকি। আর তা হয় বলেই নিজেকে কঠিন করে অমিয়া। উদাসীন কণ্ঠে বলে, 'এসব নাটকে আমার বড্ড হাসি পায়। যাই হোক গে—আপনি কী ভেবেছিলেন তা আমি জানি না, যদি কিছু ভেবে থাকেন সে দায়িত্ব আপনারই।'

অপমানে সমীরের কান লাল হয়ে ওঠে, তবু সে মিনতি করে, 'অমিয়া, লক্ষ্মীটি, তুমি বিয়ে করবে না আমাকে?'

'বিয়ে?' অমিয়া হাসে, কঠিন শীতল হাসি। বলে, 'বিয়েই যদি করব ত এখানে এসেছি কেন? ঘরকন্নার কাজে ঝি-গিরি করা এবং নিজের সারাজীবন বাঁধা দেওয়া— ও আমার ভাল লাগে না। আমাকে যে আমার স্বামীর সারাজীবনই ভাল লাগবে তার যখন কোন গ্যারান্টি নেই তখন আমি ও ঝঞ্ঝাটে যাই কেন? সন্তান প্রসব করা আর ছেলেমেয়ে মানুষ করা—সবটাই মায়ের দুঃখ। বাপ ত মুক্ত, বাইরে গিয়ে পতিতা বা অর্ধ-পতিতাদের সঙ্গে প্রেম করতে কিছুমাত্র বাধা নেই —আর সে সুযোগ যে তাঁরা কী ভাবে নেন তা ত অহরহই চোখের সামনে দেখছি—নাঃ, ও আমার পোশাবে না!'

'কিন্তু এ উৎকট আধুনিকতা তোমার ছদ্মবেশ অমিয়া, এ তোমার আসল মনের কথা হতেই পারে না।'

'কেমন করে জানলেন হ'তে পারে না? আমার যে স্বভাব-চরিত্র ভাল, আমাকে গৃহিণী করে স্ত্রী করে ঘরে নিয়ে যাওয়া যায়—তাই-বা কেমন করে জানলেন? এখানেই আড়ালে দু-পাঁচজনকে প্রশ্ন করে জানবেন তারা কী বলে।'

'তারা যা বলে তা আমি সবই শুনেছি—কিন্তু তা বিশ্বাস করি না।'

'কেন করেন না?' ওর কণ্ঠস্বর যেন আরও তীক্ষ্ণ, আরও তিক্ত হয়ে ওঠে, 'আবার সেই ছেলেমানুষের মত বুদ্ধির অহঙ্কার? এতগুলো লোকের জানাশোনা সব মিছে, আপনার বিশ্বাসই একমাত্র সত্য? ঐ জন্যই আপনাকে দেখে আমার মায়া হয় মাঝে মাঝে, বাৎসল্য জন্মায়। যান, নিজের কাজে যান! আমার এসব নাটক করবার

এখনও বয়স আসেনি। যদি বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়ে থাকে ত ভাল দেখে সমান ঘরের একটি মেয়ে খুঁজে বিয়ে করুন গে।'

সে আর সেখানে দাঁড়ায়নি। স্টুডিওতেও থাকেনি—একেবারে বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। গাড়ির অপেক্ষা সে করেনি, দারোয়ানরা ভেবেছিল আশে-পাশে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে, তারাও গাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়নি। উদ্‌ভ্রান্তের মত হাসতে হাসতে একা হেঁটে চলে এসেছে সে বহুদূর; তারপর এক সময় খেয়াল হতে একটা বাসে উঠে বসেছে। কি বাস্ তাও দেখেনি, বহুক্ষণ পরে উত্তর কলকাতার শেষ প্রান্তে পৌঁছে ভুল ভেঙেছে—তারপর আবার বাস্ বদল করে বাড়ি ফিরেছে।

হাসছিল সে ঠিকই। এ হাসি, এ বিদ্রূপ কি ওর অদৃষ্টকে? কে বলেছে? অদৃষ্ট ওকে নিয়ে বিদ্রূপ করছেন এ কথা ও মানে না। ও নিজেই চরম বিদ্রূপ করে এল ওর ভাগ্যদেবতাকে, তাতেই ও খুশি।

জীবনের এতবড় স্বপ্ন ও দেখেনি কখনও। সমীর যদি একরাত্রির সহচরী হিসাবে গ্রহণ করত তাহ'লেই ও ধন্য হয়ে যেত। ওর সারা অন্তর একবার-মাত্র তার ঐ বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে ঐ প্রশস্ত বুকে মাথা রাখবার জন্য তৃষার্ত হয়ে রয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু—বিবাহ? নারী-জীবনের চরম সার্থকতা? না, সে অসম্ভব! অন্য কেউ হ'লেও হয়ত বা সম্ভব হ'ত। সমাজকে, সংসারকে সবচেয়ে বড় প্রতারণা করে হয়ত ও একদিন কুললক্ষ্মী সেজে, নব-বধূ সেজে গিয়ে ঢুকতে পারত কোন ঘরে। কিন্তু সমীরকে ও ঠকাতে পারবে না কিছুতেই।

কিন্তু এটাই কি ওর বড় কথা?

বাস্-এ রাস্তার পর রাস্তা দ্রুত অতিক্রম করতে করতে এ কথাটা সে ভাল করে ভেবে দেখেছে, নিজের অন্তরটাকে পরিষ্কার দেখবার চেষ্টা

করেছে। সমীরকে সে ভালবাসে সত্য কথা, তার প্রতিটি পায়ের আওয়াজ ওর কাছে আজ পরিচিত, তার উপস্থিতি ও বাতাসে টের পায়, সমস্ত সত্তা ওর প্রতিনিয়ত আজ সমীরকে ঘিরে আছে এটাও ঠিক —তবু কি সে সমীরকে ঠকাবার ভয়েই আজ সরে এল ?

সমীরও কি আজ তাকে ঠকাচ্ছিল না ? তার নারী-ধর্মকে অপমান করছিল না ?

যে অমিয়া আসল, প্রায়-অশিক্ষিতা গরীবের মেয়ে, প্রসাধন-হীনা সেই কুরূপা অমিয়া যদি দাঁড়াত সমীরের সামনে—তাহ'লে কি সে ওকে পছন্দ করত ? ওদের এই ভাঙা ঘরে ডেকে এনে যদি কেউ সমীরের কাছে করত বিয়ের প্রস্তাব, তাহ'লে কি রাজি হ'ত ? যে ময়ূর-পুচ্ছ দিয়ে অমিয়া নিজের ছদ্মবেশ রচনা করেছে, সমীর প্রেম নিবেদন করেছে তারই কাছে। কিছুদিন আগে মহাকবির চিত্রাঙ্গদা নাটক ওর হাতে পড়েছিল— চিত্রাঙ্গদার কী জ্বালা, কী অপমান তা আজ অমিয়া বুঝেছে।

না, সমীর তাকে চায়নি, তাকে ভালবাসেনি। ওর চটক্‌কে, ওর মুখোষটাকে ভালবেসে, ওকে আজ বোঝাতে চাইছিল যে ওকেই সে ভালবাসে। এই মিথ্যা দিয়ে ওকে বিয়ের ফাঁদে টেনে এনে একদিন অবজ্ঞাত গৃহকোণে ফেলে রেখে আবার সে বেরিয়ে পড়ত নতুনের সন্ধানে। এত সহজে যে ভোলে, তাকে বার বার ভুল করতে হয়। তাকে বেঁধে রাখা যায় না।

নইলে ওর এই পরিচয়ের জন্য ওর লজ্জাবোধ কি ওকে আজ বাধা দিয়েছে জীবনের মধুরতম অমৃতের পাত্র মুখে তুলতে—যা নিজে সেধে মুখের কাছে এগিয়ে এসেছিল ?

মিছে কথা !

কে বলেছে ওর লজ্জা আছে। আজও ত আসবার সময় ঐ

ছেলে-মেয়েগুলো ওকে বিদ্রূপ করছিল, ছড়া কাটছিল। তাতে ওর দুঃখ নেই। আজ ওর হাসি পায়, আজ ও জানে যে যারা ওদের শিখিয়ে দিচ্ছে আড়াল থেকে, তারা হয়ত ওকে হিংসাই করে।

উপায় ছিল না সেদিন যেমন আত্মরক্ষা করার—আজও তেমনি উপায় রইল না আত্ম-সমর্পণের।

কেন ও সমীরকে প্রত্যাখ্যান করলে? এই কদর্য জিনিস, এই উচ্ছিষ্ট ও অশুভ সমীরের পায়ে নিবেদন করতে পারবে না, তাই? না। জোর করে অমিয়া ওর মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে, ওসব কুসংস্কার ওর নেই। শুধু ও চায় না ভাগ্যের এই করুণা, প্রবঞ্চনায় ঢাকা এই নতুন এক আত্মাবমাননা!

প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়। উত্তপ্ত ললাটে লোহার রেলিং-এর দাগ গাঢ় রক্তরেখায় চেপে বসে—তবু মাথা ঠাণ্ডা হয় না, চোখে তন্দ্রা নামে না।

ও বসে বসে কারণটা ভাবে, কেন ও সমীরকে প্রত্যাখ্যান করল। আসল কারণটা কি?

এটাও ওর মনে পড়ে না যে, আসল কারণটা জেনেই বা ওর কী লাভ হবে, কী সান্ত্বনা মিলবে? এ চিন্তার আর কোন মূল্যই রইল না ওর জীবনে—এটা ও বোঝে না কিছুতেই।

স্বাধীনতা

রঘু অনেক চেষ্টা করেও ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। এদের হ'ল কি? শুধু ছোটবাবু হ'লে কথাটা পরিষ্কার হয়ে যেত, কেননা ছোটবাবুর মাথাটা বরাবরই অম্নি গোলমেলে—ঐ যাকে বলে একটু আল্‌গা, কিন্তু এ যতদূর দেখা যাচ্ছে বাড়িসুদ্ধ সকলকারই মাথার গণ্ডগোল হয়েছে। সবাই ক্ষেপে উঠল নাকি?

রঘুর বয়স অনেক হ'ল। কত যে হ'ল সে হিসেব রঘুর নেই, তবে বুড়ো কর্তাবাবু, মানে এখনকার যিনি বড়বাবু, তাঁর ঠাকুরদা—তাঁর আমলে সে এ বাড়িতে বাহাল হয়েছে। এঁরা বলেন সে-ই আজ আড়াই-কুড়ি বছরের ওপর হ'ল, আর সে যখন এখানে এসেছে তখন সে বেশ জোয়ান, কম্‌সে কম এক কুড়ি ত হয়েছেই! তা এতখানি বয়সে সে দেখেছেও ত কম নয়। স্বদেশী সে বোঝে—যতদিন এ বাড়িতে সে চাকরি নিয়েছে ততদিন থেকেই শুনছে কথাটা। কত কাণ্ড হ'ল—দাড়ি-ওলা দুটো বাবু আসত কর্তাবাবুর কাছে, একটা বাবু কি পদ্য না কি লিখত, খুব সুন্দর চেহারা, মিহি গলায় কথা বলত, লম্বা লম্বা চুল—আর একটা বাবু সে কোন্ বড় ডাক্তারের ছেলে, তারও দাড়ি ছিল, কোন্ কলেজে নাকি পড়াত; বাবা, তার গলা তো নয় যেন মেঘ ডাকত—এই দুটো বাবুই বুড়ো কর্তাবাবুকে নাচিয়েছিল আচ্ছা ক'রে। কোথাও কিছু নেই, সব ভাল ভাল কাপড় জামা উঠোনে জড় করে পুড়িয়ে দেওয়া হ'ল, মোটা চটের মত কাপড় এল, সাদা নুন উঠে গিয়ে লাল পাথুরে নুন এল, শুরু হল গুড় দিয়ে চা খাওয়া। আর

সে কী চীৎকার, বন্দে মাতরম্ না কী যেন বলে। কত মিটিং হ'ল—কত গান গেয়ে গেয়ে রাস্তায় ঘোরা—কত কি!

ঐ কিছুদিন। তারপর যেমন চলছিল তেমনিই চলতে লাগল। এর দিনকতক পরে এল লড়াই। লড়াইটা কোথা তা রঘু জানে না, সে নাকি কোন্ দূর বিদেশে, হেঁটে গেলে বছর খানেক লাগে পৌছতে। তবু তার ঠেলা এখানেও কিছু কিছু লাগল বৈ কি! হৈ হৈ ব্যাপার, কোথায় মাদ্রাজ আছে সেখানে জাহাজে করে এসে গোলা ছুঁড়ে গেল। ওধারে কোথা দিয়ে নাকি রুশ না কি এক জাত আসবে—ভয়ে বাবুদের ঘুম নেই। জিনিসপত্রের দাম চড়ে গেল, বিলিতি কাপড় আসা বন্ধ হল, গরিবের মহাদুর্গতি। তারপর—লড়াই দু'চার বছর থামতে না থামতেই আবার স্বদেশী হুজুক এল। এক গান্ধী এল কোথা থেকে, তাকে আবার সবাই বলে মহাত্মা—সে-ই এ হুজুক আনলে। আবার সব বিলিতি কাপড় পোড়ানো হ'ল, সিগারেট ছাড়া হ'ল—গুড়ে চা খাওয়া হ'ল। ছেলেরা স্কুল কলেজ ছাড়লে—বাবুরা আপিস ছাড়লে—মেয়ে-মদ্দে মদের দোকান গাঁজার দোকানের সামনে শুয়ে পড়ল—মেয়ে-মদ্দে জেলে যেতে লাগল শখ করে—আরও কত কি। যায় উকিলরা পর্যন্ত ওকালতি ছেড়ে দিলে। ওদের গাঁয়ের এক বড় উকিল সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বেলে বেলে একটি করে পয়সা ভিক্ষা করে ইস্কুল করলে। সে নাকি হবে স্বদেশী ইস্কুল—ইংরেজদের তাঁবে লেখাপড়া পর্যন্ত শেখানো হবে না।

আবার সব হৈ চৈ জুড়িয়ে গেল। শুধু ছোটবাবুর লেখাপড়াটাই আর হল না। বুড়ো কর্তাবাবু যাবার সময়ও সেই দুঃখ করেছিলেন। কিন্তু বড়বাবু কোনদিন কিছু বলেননি ছোটভাইকে—সব চেয়ে ছোট ভাই, চিরকাল প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন আর আদর দিয়েছেন। দু'বার না তিনবার জেলেই গেল। রঘু ছেলেবেলা থেকে জানত

যে, চোর ডাকাত আর বদমাইসরাই জেলে যায়—সে ভারি লজ্জার কথা, তাদের গরিব দুঃখীর ঘরেও ওটা বে-ইজ্জতের কথা ব'লে ধরা হ'ত।

কিন্তু এ দেখে সব উল্টো, ছোটবাবু যত জেলে যায় তত খাতির বাড়ে। ফুলের মালা আসে, মিটিং হয়—বড় বড় কথা বলে সবাই, বড় বড় লোক মোটরে করে এসে ছোটবাবুর খোসামোদ করে, যেন কী কীর্তিই করে এসেছে।

এমনি ঠুকঠাক করে চলছিল, আবার এল এক হিড়িক। আইন নাকি আর কিছু মানা হবে না। আবার সব বিলিতি জিনিস বন্ধ হ'ল, মায় ওষুধ পর্যন্ত। অসুখের সময় এবার কবিরাজ ডাকা হ'তে লাগল, পাছে ডাক্তার এসে বিলিতি ওষুধ ব্যবস্থা করে। সিগারেট বন্ধ হ'ল—বিড়ির আগুনে কত যে নতুন কাপড় ফুটো হ'ল আর ফরাসের বড বড বোম্বাই চাদর পুড়ল—তার ইয়ত্তা নেই। ছোটবাবু দলবল নিয়ে মেদিনীপুরের দিকে কোথায় গেলেন নুন তৈরি করতে। তিন পয়সা সেরের নুন নিয়ে কেন যে এত আদিখ্যেতা তা রঘুর মাথায় কিছুতেই যায় না। ছোটবাবুর জেল হ'ল, বড়বাবু—মানে এখনকার বড়বাবু, কলেজ ছেড়ে মদের দোকানে পিকেটিং না কী করতে গেলেন, সেখানে চোরের মার খেয়ে জেলে গেলেন। কেন যে সুখে থাকতে এমন করে ভূতে কিলোয়—আশ্চর্য! শঙ্করবাবুর কুড়িটা নখে আলপিন বিঁধিয়ে ফেলে রেখেছিল হাত পা বেঁধে, রোদ্দুরের দিকে মুখ করে। শম্ভুবাবুকে এমন মারলে যে এখনও পর্যন্ত বেচারাকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়; বেশিক্ষণ চেয়ারে বসে থাকতে পারে না, কোমরের যন্ত্রণায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় গিয়ে শুয়ে পড়তে হয়। ওদের কী এক পাটের দালালির আপিস হয়েছে, শম্ভুবাবুর জন্যে সেখানে বিছানা রাখতে হয়েছে। কাজ করতে

করতে এসে শুয়ে পড়ে সেখানে। থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখা চিরকালের মত বন্ধ হয়ে গেছে।

তারপর আবার সব থিইয়ে গেল। ছোটবাবু ছাড়া পেলেন, বড় দাদাবাবু ফিরে এল, শঙ্কর এল, শম্ভু এল। বিলিতি কাপড় কেনা হয় না বটে, কিন্তু পমেটম পাউডার সিগারেট সবই চলে। বিলিতি বায়োস্কোপ নইলে পছন্দ হয় না। তারপর আবার নাকি কোথায় লড়াই বাধল। তখন ত বিলিতি জিনিস কেনবার ধুমই পড়ে গেল—যে যা পারলে কিনে ঘর-বাড়ি বোঝাই করলে। চারগুণ, পাঁচগুণ, আটগুণ, দশগুণ দামে বিক্রি হ'ল সেই সব। যুদ্ধের সঙ্গে ব্যবসাও বেড়ে চলল—দামী বিলিতি পোশাক তৈরি হয়ে এল সব—সবাই সাহেব হয়ে গেল রাতারাতি। ঘুষ, চোরাবাজার—এরই ওপর সংসারটা ফুলে ফেঁপে উঠল। ছোটবাবু বিয়ে করেননি—পৈতৃক পয়সা তাঁর ভাগেই বেশি ছিল, আগে ছিলেন তিনিই বড়লোক। কিন্তু ভাইপোরা যুদ্ধের বাজারে প্রত্যেকে লক্ষপতি হয়ে উঠল—ছোটবাবুই এখন গরিব। ইচ্ছে করলে তিনিও করতে পারতেন, কিন্তু কিছুতে রাজি হলেন না। তিনি এখনও মোটা খদ্দর পরেন—রঘু ত আর কাচতেই পারে না—ভাইপোদের সঙ্গে এই নিয়ে ঝগড়াও হয়ে গেছে খুব। বার-কতক অপমানিত হয়ে এখন তিনি চুপ করে গেছেন। অধর্মের পয়সা তিনি না ছুঁতে চান—দরকার নেই, কিন্তু ভাইপোদের উপদেশ দিতে আসার কী অধিকার আছে তাঁর? তারা এখন প্রত্যেকেই সাবালক, কেউই তাঁর চেয়ে কম লেখাপড়া জানে না।

এমনি করে রঘু দেখেছে ঢের। এসব কথা সে বোঝেও ঠিক, কিন্তু এইবারের ব্যাপারটাতে সে একটু ঘাবড়ে গেছে। হঠাৎ আবার

নতুন করে খদ্দর কেনা হচ্ছে। মেয়েদের জন্যে মিহি খদ্দরের শাড়ি কিনতে সরকার মশাই গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠলেন। বাড়িঘর সাজানোর ধুম পড়ে গেছে, উঠোনের মধ্যে রাজমিস্ত্রি ডেকে সিমেন্ট দিয়ে এক বাঁশ দাঁড় করানো হয়েছে। সেখানে নাকি পতাকা উঠবে। শম্ভুবাবু, শঙ্করবাবু ওঁদের আপিসের বাবুদের এক মাসের করে মাইনে আগাম দিয়েছেন—বাড়ির ঝি-চাকরদেরও একখানা করে কাপড় কিংবা অভাবে দুটো করে টাকা দেওয়া যায় কিনা চিন্তা করা হচ্ছে। তাছাড়া, খাওয়া-দাওয়া ভোজের আয়োজনও একটা আছে—সেটা নাকি আসছে কাল, লক্ষ্মীবারে—রাত একটার পর। বুড়ো-কর্তার আমল থেকেই এ বাড়িতে লক্ষ্মীবারে মাংস পেঁয়াজ হাঁসের ডিম রান্না হয় না, সেই কথাটা গিন্নিমা —মানে বড়বাবুর মা—তুলতে গিয়েছিলেন, তাতে বড়বাবু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, রাত একটার পর আজকালকার মতে শুক্রবার পড়ে যায়—আর লক্ষ্মীবারে যখন খাওয়া হচ্ছে না তখন রাঁধতে দোষ কি? তাছাড়া, এমন দিনে ওসব কথা না তোলাই ভাল—দু'শ বছর পরে নাকি কী একটা পাওয়া যাচ্ছে, এদিনে কি আর ওসব মানা উচিত?

দু'শ বছর নাকি দশ কুড়ি বছর। সে কত দিন তা রঘু ঠিক ঠাওর করতে পারে না, তবে এইটুকু বোঝে যে—অনেক দিন। এতদিন পরে কী আসছে? এদের কোন তালুক কি? আগে খোওয়া গিয়েছিল, এতদিন পরে পয়সা হয়ে আবার কিনে নিচ্ছেন? না, তাই বা কেমন করে হবে? আশপাশের বাড়িতেও কেমন যেন একটা সাড়া পড়ে গেছে। আবার শম্ভুবাবু বলছিল কোন্ আপিসে নাকি পনেরো দিনের মাইনে দিয়েছে সব বাবুদের, কোন্ আপিসে সাতদিনের। এদের তালুক কেনার জন্যে যে তারা বাবুদের বেশি মাইনে দিচ্ছে না এটা ঠিক। তাহ'লে ব্যাপারটা কি?

মাতু ঝি আর হরু ঠাকুরকে সে জিজ্ঞেস করেছে। হাজার হোক, এখনকার লোক ওরা, আরও পাঁচটা বাড়িতে কাজ করেছে—অনেক জানে শোনে। কিন্তু তাতেও কিছু সুবিধে হয়নি। মাতু ঝি বললে, 'ব্যাপারটা বুঝলে না দাদু? আমরা এতদিন স্বাধীন ছিলুম এইবার পরাধীন হলুম!'

হরু ঠাকুর ত একথা শুনে হেসেই খুন! সে বলে, 'আর যা বলিস বলিস মাতু, ঠিক উল্টোটা বলিসনি। আমরা এতদিন পরে স্বাধীন হলুম।'

'তার মানেটা কি?' সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করে রঘু, 'কী ছিলুম আর কী হলুম?'

হরু ঠাকুর পানের পিক্‌ ফেলে বললে, 'এতদিন ইংরেজরা ছিল রাজা, এইবার মুসলমানদের রাজা করে দিয়ে ওরা চলে গেল।'

মাতুর মেয়ে কমলি, সে ছেলেবেলায় পাঠশালে গিয়েছিল, শাড়ির সঙ্গে সেমিজ পরে, সে বললে, 'দূর! মুসলমানদের কী সব তালুক দিয়ে দেওয়া হয়েছে আলাদা করে। তা নয়—গান্ধী মহারাজ আমাদের রাজা হলেন, তাই সব আনন্দ। খাজনা টেক্স কিচ্ছু থাকবে না। রামরাজত্বি হবে—'

এসব কোন কথায় রঘুর বিশ্বাস হয়নি, বলা বাহুল্য। এরা কিছুই জানে না, সব আন্দাজে আন্দাজে ঝাপসা কথা বলছে।

পাঁড়ে দরওয়ানকে জিজ্ঞাসা করে এসেছে এইমাত্র। পাঁড়ে বলেছে, 'আরে রঘুদাদা, এই কথাটা তুমি সমঝালো নেই? আংরেজ রাজা ছিল, এইবার চলিয়ে গেল। মহাত্‌মাজী ওদের চলিয়ে যেতে বলেছেন—কেঁও কি, নেহরুজীকে রাজা বনাইয়ে দিবেন।...জয় রামজী কী! বড় ভালো হ'ল ভাই রঘুদাদা, বহুত খুশির বাত আছে!'

বড়বাবুর ছেলে বিজয় যাচ্ছিল একটা পেন্সিল হাতে করে লাফাতে লাফাতে—রঘু তাকে দাঁড় করালে। ইস্কুলে পড়ে বিজয়, এইবার পাস দেবে। লেখাপড়া শিখেছে—কথাটা বুঝিয়ে দিলেও দিতে পারে।

প্রশ্নটা শুনে সে একটু অসহিষ্ণুভাবেই বললে, 'আরে, স্বাধীনতা! এটা বোঝা না? আমরা আর কারুর অধীন রইলুম না। এখন আমরা যা করব তাই হবে।'

'তার মানে—রাজা থাকবে না?' রঘু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'না। আমরাই রাজত্ব চালাবো। সকলকার ভোট থাক্‌বে। ভোট! তুমিও ভোট দিতে পারবে—'

বিজয় তেমনি লাফাতে লাফাতে চলে গেল। কিন্তু রঘুর আদৌ ভাল লাগে না। রাজা থাকবে না কী, অরাজক রাজত্ব হবে নাকি? রাজা ছাড়া রাজত্ব চলে? ঐ সব চ্যাংড়া ছোঁড়ারা বলে কি না, ওরা যা করবে তাই হবে! তার চেয়ে পাঁড়ের কথাটা ওর মনে লেগেছে। নেহেরু না নাহরু কী বললে—সে-ই রাজা হবে! তা হোক, রাজা একটা থাকা দরকার।

মাতুও কথাটা একটু তলিয়ে বুঝেছে এতক্ষণে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় রঘুকে গিয়ে ধরেছে সে। সে বলে, 'দাদা, শুনছি এইবার যা হবে তাতে নাকি দেশে আর কারুর দুঃখ বলে কিছু থাকবে না। সবাই খেতে পাবে বসে। তা দাদা, আমি যদি এখন চাকরি ছেড়ে দিই—খেতে পাবো?'

রঘু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে, 'কি জানি!'

'দ্যুৎ—আমার ত তা বিশ্বাস হয় না। কে খেতে দেবে? আসমান থেকে ত আর পড়বে না।'

তারপর আর একটু থেমে বললে, 'দু বছরের মোটে বাকি খাজনার

জন্যে ভিটেটা বেচে নিলে চাটুয্যেরা, মাথা গুঁজে দাঁড়াবার ঠাঁই রইল না। এখন কি সেটা ফিরে পাওয়া যাবে তা হ'লে ?'

'দূর, তাই কি কখনও হয়! সে সব আইন আদালত থেকে ঠিক হয়ে গেছে। তা ছাড়া, তুই ত বলেছিলি সব সমভূম করে দিয়েছে, সেখানে কী ফেরত পাবি ?'

তা বটে। চুপ করে থেকে থেকে মাতু বললে, 'তা হ'লে আর কী রাম-রাজত্ব হ'ল তা ত বুঝি না।...'

ক্ষেন্তির মা এসে বসল ওদের কাছে। ওর মেয়েটার আজ সাতদিন জ্বর। সিঁড়ির নিচেকার যে ঘরখানাতে ওরা থাকে সেটা যেমন অন্ধকার, তেমনি স্যাঁতসেঁতে। আজ অনেক হাতে-পায়ে ধরে পাড়ার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বিশু মল্লিককে ডেকে এনেছিল ক্ষেন্তির মা— তিনি বলে গেছেন এ ঘরে থাকলে মেয়ে বাঁচবে না। হয়েছে বোধ হয় টাইফয়েড, এখানে থাকলে তার ওপর নিউমোনিয়া ধরে যাবে। সে ভয়ে ভয়ে গিন্নিমার কাছে দরবার জানাতে গিয়েছিল, তিনি জবাব দিয়েছেন, 'তা বাছা, তোমার নবাব-নন্দিনীর জন্যে আবার তেতালার ঘর কোথা থেকে পাবো বলো। না পোষায় তুমি কাজ ছেড়ে দাও।'

কথাগুলো বলতে বলতে ক্ষেন্তির মা কাঁদতে লাগল। রঘু বললে, 'তা তোমার দেশে নিয়ে যাও না, ক'দিনের ছুটি নিয়ে। মেয়ে সেরে গেলে এসো তখন। আর ছুটি না দিলেই বা কি, এখন কি আর কাজের ভাবনা ?'

ক্ষেন্তির মা মাথা নেড়ে বললে, 'সে উপায় নেই দাদা। বিধবা হয়ে দেশ ছেড়েছি অনেক দুঃখে। কিছুই যখন রইল না তখনই না বেরোলুম। সেই মন্বন্তরের বছরে দেশ ছেড়েছি, আর একদিনও যাইনি। ঘরদোর কি আর আছে ? তাছাড়া যদি বা জ্ঞাতিগুষ্টির

বাড়ি উঠি, এখানে কাজ থাকবে না। কি খাবো আর কি খেতে দেবো ? একটা মেয়ে নিয়ে রাতদিনের কাজ পাওয়াও শক্ত ভাই।'

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল। রাত্রে, তখনও বারোটা বাজেনি, রঘু গেল ক্ষেন্তির মার হয়ে সুপারিশ করতে, 'বৌমা, ক্ষেন্তির জরটা বাঁকা, ওর মা বলছিল কাল সকালে হাসপাতালে একটু দেখিয়ে আসতে পারে, সকালটা যদি ছুটি দ্যান্।'

বৌমা বললেন, 'পাগল নাকি! আজ সব স্বাধীনতার খাওয়া-দাওয়া, কাল বাড়ি একেবারে একাছত্তর হয়ে থাক্‌বে। বাসোন-কোসন ছিষ্টি বেরোবে আজ, কাল কখনও ছাড়া যায়! পরশু না হয় যাবে'খন।'

রঘু ঘরে গিয়ে বসল। সে দিন আর নেই, কর্তাবাবুর আমলে সে যা বলেছে তাই হয়েছে। বড়বাবুও তাকে স্নেহ করতেন খুব, সমীহও করতেন। কত ধমক দিয়েছে সে তাঁকে। এরা সে সব বোঝেই না, চাকরের মতই দেখে।

না, এখানে থাকা বিড়ম্বনা। কিন্তু কোথায়ই বা যাবে! এত দীর্ঘকাল এখানে চাকরি করেছে যে অন্য কোন বাড়ির কথা ভাবতেই পারে না। তাছাড়া, তার নেইও কেউ কোথাও। তিনবার বিয়ে করেছিল, তিনবারই বৌ মরেছে বছরের মধ্যে। শুধু সেই পণের টাকা এদের কাছে যা ধার করতে হয়েছে, তাই শোধ দিয়েছে সারা জীবন ধরে। দেশে থাকার মধ্যে আছে এক ভিটে, আর বিঘে-খানেক জমি ওর ভাগে, তাতে কী হবে ? টাকাও বিশেষ কিছু জমাতে পারেনি, বড়জোর পাঁচ-ছ'কুড়ি টাকা ওর হাতে আছে, তাতে আজকাল এক বিঘেও হয় না। খাবে কী ? এ বুড়ো বয়সে অন্য কেউ কাজ দেবে না— তার খাটবারও আর সামর্থ্য নেই। এখানে তবু ওর অসুখ হ'লে এরা ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে।

বড়বাবুর খানসামা জীবন বেচারারও ঐ হাল! দেশে সব জমিজমা বন্ধক ছিল এঁদেরই কাজে। পাঁচ বছর না ছ' বছর খেটে যেমন শোধ দিলে, ওর বড় ছেলেটার হ'ল বিষম অসুখ, যমে-মানুষে টানাটানি, আবার সব বাঁধা পড়ল। সে যদি শোধ হ'ল ত কী একটা মোকদ্দমা— তার দেনা এখন বাপ-বেটা খেটে শোধ দিচ্ছে। আহা, ঐটুকু ছেলে জীবনটার—লোভে পড়ে ভাঁড়ার থেকে একটা কলা চুরি করে খেয়েছিল, কী মারই দিলে সবাই মিলে। তবু জীবন কাজ ছাড়তে পারে না, টিকি পর্যন্ত বাঁধা দেনার দায়ে, ছাড়বে কি করে?

অকস্মাৎ চারিদিকে শাঁখ আর হুলুধ্বনি বেজে উঠল। রাত একটা বাজল বুঝি? চোখ মুছতে মুছতে রঘু বেরিয়ে এল। হ্যাঁ, ঐ যে, বড় বৌমা পতাকার তলায় প্রদীপ আর ধূপধুনো জ্বেলে দিচ্ছেন। ছোট বউ খই আর ফুল ছড়াচ্ছে চারদিকে। স্বাধীনতা এল বৈ কি! রাস্তায় বিষম হল্লা—'জয় হিন্দ,' 'বন্দেমাতরম' আর 'হিন্দু-মুসলিম এক হো' এই বিকট চীৎকার উঠছে থেকে থেকে। স্বাধীনতার নাকি এমনই মহিমা যে, এতদিনের দাঙ্গা যেন জাদুমন্ত্রে মিটে গেল। 'জয় স্বাধীনতার জয়!' 'মহাত্মাজীর জয়!' বড়বাবু নিজে চেঁচিয়ে উঠলেন।

শঙ্কর গাঢ় স্বরে বললেন, 'তাহ'লে কি এবার সত্যিই পেলাম আমরা স্বাধীনতা, ছোটকা?'

ছোট কাকা ওকে বুকে চেপে ধরলেন নীরবে, তাঁর চোখে জল।

...রঘু নিজের হাত-পার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর বাড়ির সবাইকার দিকে, তারপর চাইলে বাইরের দিকে। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। কী পেলে ওরা, এমন কী এল? এখনও রঘু বুঝতে পারে না।

দাঁড়াবার আর সময় নেই। বহুলোক নিমন্ত্রিত হয়েছে, এত রাত্রে খাবে সবাই! ঠাঁই করতে হবে, পাতা-গ্লাস সাজাতে হবে, জল দিতে হবে। এই সব হালকা কাজগুলোই রঘু করে এখন। কিছু ত করতেই হবে—বসিয়ে মাইনে দেবে কে?

শঙ্করবাবু বড়বাবুকে বলছেন কানে গেল, 'বার্মা শেলের বাবুরা শুনছি নাকি জোর করে দু'দিন ছুটি আর পনেরো দিনের মাইনে আদায় করেছে। কিন্তু আমাদের চক্রবর্তী ওদের অফিসে কিছুতে ছুটি দিলে না। আশ্চর্য, একদিন কাজ না হ'লে যেন ওর ফার্মের সর্বনাশ হয়ে যেত।'

'চামার! চামার!' সংক্ষেপে মন্তব্য করলেন শম্ভুবাবু।

জল নিয়ে যেতে যেতে রঘু শোনে ক্ষেন্তিটা জ্বরের ঘোরে কাৎরাচ্ছে। বোধ হয় গলা শুকিয়ে গিয়েছে। একটু জল চায়। কিন্তু দেবে কে? ওর মায়ের এখন নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। কত কাজ, দু'ঘণ্টার এদিকে আর ফুরসৎই পাবে না সে ঘরে আসবার।

ও-ই একটু জল দিয়ে আসবে নাকি?

অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর শোনা যায় বড়-বৌমার, 'রঘু! রঘু! না, বুড়োকে নিয়ে আর আমি পারি না। এক জগ্ জল আনতে এক ঘণ্টা!'

ক্ষেন্তির দিকে আর যাওয়া হ'ল না। রঘু জলের জগ্ হাতে ক'রে দৌড়ল।

সাধ

একটা সরু গলি এসে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্লাইণ্ড লেন, কানা গলি। তারই দু-পাশে চার পাঁচটি দু'তালা বাড়ি, বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে মিলিয়ে দশ-বারো ঘর গৃহস্থ, আর একটি ছোট বস্তি। একখানা বড় চালার নিচে সার সার খান সাতেক ঘর, তাতে থাকে ঘরামি, জেলে, মেছুনী, আরও কত বিচিত্র-বৃত্তির নরনারী।

এই সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যেই আমাদের রাণী-ঝির জীবননাট্যের প্রথম থেকে শেষ অঙ্ক পর্যন্ত অভিনীত হয়ে গেল, এটা বিস্ময়ের কথা বৈ কি! ওর জীবনের যা কিছু ছোটবড় ঘটনা সব এখানেই ঘটল, হয় এবাড়ি, না হয় ওবাড়ি। আর কোথাও ওকে যেতে হ'ল না—এমন কি, এই বিশেষ গলিটির বাইরে কোথাও না।

অবশ্য, হ্যাঁ, একটু ভুল হয়েছে।

ওর প্রথম অঙ্ক যা আদি পর্ব, যা-ই বলুন না কেন, সেটা আমরা জানি না। সেটা কিছু নেপথ্যে ঘটেছিল। তবে তার বিবরণ অনেকটা শুনেছি, লোকমুখেও বটে, ওর মুখেও বটে।

রাণী ওর আসল নাম নয়। ওর মা নাম রেখেছিল মঙ্গলা; সেই নামেই ওর বিয়েও হয়েছিল। বিয়ে হয়েছিল ওর এগারো বছরে দক্ষিণ দেশের কোন্ গ্রামে, চাষার ঘরে, কিন্তু সে শ্বশুর-ঘর ওর পছন্দ হয়নি। বছর তিনেক পরে ও পালিয়ে এল মায়ের কাছে—আর শ্বশুরবাড়ি ফিরে যায়নি। তারা নাকি মার-ধোর করে, গোবর নাদি দিতে বলে, ধান মাড়ায়, কাপড় কাচায়—অত কাজ সে পারবে না। ওর মা ক্ষেন্তি অনেক চেষ্টা করেছিল ওকে পাঠাবার, স্বামী বেচারীও

এসে হাতে-পায়ে ধরাধরি করেছিল, কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হয়নি, শেষ পর্যন্ত একটা খড়-কাটা বঁটি নিয়ে তেড়ে গিয়েছে। সে বেচারী কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গিয়েছিল। মঙ্গলা দেখতে ভালই ছিল, কতকটা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের মতো—বেচারীর ভারি পছন্দ হয়েছিল বৌকে। হাজার হোক্ সেও ছেলেমানুষ ত।

কিন্তু শ্বশুরবাড়ির প্রতি ওর এই বিতৃষ্ণার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে, এর মূলে আছে ক্ষেন্তিই। ক্ষেন্তি ছিল দত্তবাবুদের বাড়ির রাতদিনের ঝি, খুব পুরানো আর বিশ্বাসী বলে তাঁরা বাগানের মধ্যে ক্ষেন্তিকে একটা টিনের ঘর করে দিয়েছিলেন, সে ঘরে ছিল ইলেকৃটি্রক আলো। মঙ্গলা মানুষ হয়েছে দত্তবাবুদের ছেলেমেয়ের সঙ্গেই—একসঙ্গে খেলাধূলো, বসা-দাঁড়ানো। ফুটফুটে মেয়ে বলে গিন্নীরা ওকে খুব ভালবাসতেন। বরাবর পূজোর সময় ভাল ফ্রক, এবং পরে শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ সায়া দিয়েছেন। একটু জ্ঞান হবার পর থেকেই সে মেজবৌর কাছ থেকে পাউডার চেয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরে রাখতে শুরু করেছিল, নতুন বৌ ওকে গোপনে জোগাত স্নো, ক্রীম। অর্থাৎ তার কোন শিশি অর্ধেক খালি হ'লেই ওকে দান করে দিত। তারপর সবচেয়ে চমক লাগানো ঘটনা ঘটেছিল ওর বিয়েতে, যদিও বিয়েটা ক্ষেন্তি দিয়েছিল দেশে গিয়েই, দেওর-ভাসুরদের দৈহিক সাহায্যে—দত্তবাবুরা এখান থেকে ঘি ময়দা দিয়ে দিয়েছিলেন, মঙ্গলার বিয়েতে বরযাত্রীদের লুচি খাওয়ানো হয়েছিল, যা ওদের দেশের এবং জাতের ইতিহাসে কখনও হয়নি। ওদের খুব ভাল খাওয়া-দাওয়া হ'ল, ভাতের সঙ্গে অঢেল মাছ, দইয়ের সঙ্গে জিলিপি বা বোঁদে। খেতে বসে মঙ্গলার জ্যাঠাশ্বশুর নাকি দুঃখিতভাবে ঘাড় নেড়েছিলেন, 'এ-মেয়ে কি আর আমাদের ঘর করতে পারবে নগিন্দর,

কাজটা বড় খারাপি হ'ল।' নগিন্দর অর্থাৎ নগেন্দ্র। মঙ্গলার শ্বশুরও নাকি তখন বিশেষ ভরসা পাননি।

সুতরাং এ-হেন মঙ্গলার যদি সেই গরিব চাষী-গৃহস্থের বাড়িতে জীবনযাত্রা খারাপ লেগে থাকে ত খুব দোষ দেওয়া যায় কি? আর গরিব না হ'লে কেউ ঝিয়ের মেয়েকে পুত্রবধূ করবেই বা কেন? যেসব অল্পবয়সী মেয়ে এইসব শহরতলীতে ঝিয়ের কাজ করতে আসে, দেশেঘাটে সবাই তাদের চরিত্রকে প্রথমটা সন্দেহের চোখেই দেখে; অবশ্য ক্ষেন্তির কথা একটু স্বতন্ত্র—সে বরাবরই একটা বাড়িতে কাজ করেছে—তাও রাত-দিনের, তবু সম্ভ্রান্ত গৃহস্থরা ওর মেয়েকে বধূ করবে তা আশা করা যায় না।

মঙ্গলা শ্বশুরঘর থেকে চলে আসার মাস-তিনেক পরে ওর একটা ছেলে হ'ল। ছেলেটিকে নিয়ে যাবার জন্যও একবার ওর স্বামী চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মঙ্গলা দিলে না। অবশ্য ছেলেটা বাঁচলও না; বছর দুই লিভারের রোগে ভুগে মারা গেল; আর তার কিছুদিন পরেই হঠাৎ দুদিনের জ্বরে ক্ষেন্তিও।

এইবার মঙ্গলা চোখে অন্ধকার দেখলে। ও যখন শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এখানে চলে আসে তখন জানত যে, আর যাই হোক, দত্তবাবুরা মায়ের সঙ্গে ওদেরও দুমুঠো ভাত দিতে ইতস্তত করবে না। না হয় ও দু-একটা কাজই করে দেবে। আর মাথার ওপর আশ্রয় ত আছেই। ঘরখানা ভাল, বিলিতি মাটির মেঝে, ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালানো। এমন কি ছেলেবেলা থেকে নিশ্চিন্ত আহার ও নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে ওর এমনিই একটা নির্ভরতা এসেছিল যে, মা যখন মারা গেল তখন অতটা অসহায় ভাবেনি নিজেকে।

কিন্তু কিছুদিন পরেই বড়কর্তা 'নোটিশ' দিলেন। অবশ্য মঙ্গলা

মায়ের কাজগুলো নিজে থেকেই করতে শুরু করেছিল। ভেবেছিল, যখন ওদেরও লোকের দরকার তখন আর এ বন্দোবস্তে কেউ আপত্তি করতে চাইবে না। কাজেই বড়বাবুর নোটিশটা একেবারে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই এসে পড়ল। মঙ্গলা মুখ শুকিয়ে বড়গিন্নীর কাছে গেল, কিন্তু তাঁরও কিছু উপায় ছিল না, কারণ তিনি আগেই এ দরবার করেছিলেন, মঙ্গলা বলবার আগেই। বড়কর্তা তার উত্তরে বলছিলেন—'কপালে টিপ, মুখে পাউডার, গায়ে ব্লাউজ, সতেরো আঠারো বছর বয়স, রংটা প্রায় ফরসা—রাখতে চাও রাখো। তবে একবার ছেলেদের সঙ্গে ও যখন ইয়ার্কি করে, তখন তাকিয়ে দেখো চোখ মেলে। এরপর আমি আর কোন দায়িত্ব রাখব না। নিজের ছেলেদের মাথা খেতে হয় তুমিই খাও—খাল কেটে যে কুমীর ঢোকানো হয়েছিল, সে এমনি কি আর যাবে! একটা ছুটোকে নিয়েই যাবে, তা জানি।'

এর পর আর গিন্নী কী বল্‌বেন? তা ছাড়া, তাকিয়েও তিনি দেখলেন চোখ মেলে। দেখলেন যে, এর আগেই তাঁর এসব দেখা উচিত ছিল, এসম্বন্ধে সচেতন না হয়ে নিজেই অন্যায় করেছেন। যারা একসঙ্গে ছেলেবেলা থেকে বেড়ে উঠেছে তাদের ইয়ার্কি করাটা হঠাৎ দৃষ্টিকটু দেখায় না—এমন কি যারা করছে তারাও সবসময়ে বুঝতে পারে না যে, ব্যাপারটা কতদূর গড়ালো। কিন্তু যারা ছিল এককালে চার পাঁচ সাত বছরের, আজ তারাই হয়েছে সতেরো, আঠারো, কুড়ি; বয়স তার স্বধর্ম পালন ক'রে গেছে ঠিকই, ফলে ওদের হাসিঠাট্টার চেহারাটা বাইরে থেকে সমান থাকলেও তার রংটা পাল্‌টেছে। সময়টা হয়ে উঠেছে দীর্ঘ, অবসর ও সুযোগ অসংখ্য। এতবড় একান্নবর্তী পরিবারে উনিশ-কুড়ি-একুশ বছরের তরুণ ছেলের অভাব নেই। আরও বিপদ, তারা মঙ্গলাকে কিছুতেই ঝি বা ঝিয়ের মেয়ে বলে ভাবতে পারে না। ওদের খেলার

সাথী সেই ফুটফুটে মেয়েটি এখন তরুণী হয়ে উঠেছে। সে যখন সন্ধ্যায় পাতাকেটে চুল বেঁধে, মুখের ওপর পাতলা একটু পাউডারের প্রলেপ বুলিয়ে রঙীন শাড়ি প'রে ঘোরাফেরা করত তখন তার সঙ্গে সমপর্যায়ের মেয়ের মত রহস্যালাপ করতে কারুরই বাধত না।

এই সব দেখে-শুনে বড়গিন্নীও কঠিন হয়ে রইলেন। তবে যাবার সময় ক্ষেন্তির যে টাকা জমা ছিল, তার ওপর আরও পঞ্চাশটি টাকা ওর হাতে দিয়ে দিলেন। আর নতুন শাড়ি একজোড়া ; এ ছাড়া বৌয়েদের ঘর থেকে আলতা, সিঁদুর, স্নো, ক্রীম, পাউডার, জামা, জামার ছিট্ বর্ষিত হ'ল ওর ওপর। মেজগিন্নী চোখ মুছে বললেন, 'শ্বশুরবাড়ি যাবারই চেষ্টা কর্ মঙ্গলা, বাইরে ঝি-গিরি করার চেয়ে শ্বশুরবাড়ি ঝিয়ের মত খাটা ঢের বেশি সম্মানের।'

বড়গিন্নী বললেন, 'আর না হয় দেশে কাকার কাছেই যা। টাকাকড়ি যা হাতে পেলি, চার পাঁচ বিঘে জমি নিজের নামে কিনে নিগে যা। তাহলে কারুর হাত-তোলায় থাকতে হবে না।'

বলা বাহুল্য, এসব কোন পরামর্শ ই মঙ্গলার ভাল লাগল না। তার আত্মীয়া ছিল আমাদের এ পাড়ার এই বস্তিতে, সে সেইখানে এসে দুদিন থেকেই ভবদেববাবুর বাড়ি চাকরি জোগাড় করে নিলে।

এই সময়েই মঙ্গলা মরে গিয়ে রাণী হয়ে জন্মাল।

নিজের নাম বললে, রাণী। মঙ্গলাটা ওর পছন্দ নয়। ইচ্ছে ছিল অমিয়া বলে নিজেকে, দত্তবাড়ির সবচেয়ে সুন্দরী ন-বৌয়ের ওই নাম—শুধু চক্ষুলজ্জাতে পারলে না।

ভবদেববাবু প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, নিজে আর স্ত্রী। একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, সে থাকে না। তার একটি ছেলে বা মেয়ে পালা করে

থাকে ওঁদের কাছে। আশা করা গিয়েছিল, রাণী এখানে টিকতে পারবে।

কিন্তু বিপদ হ'ল এই যে, রাণী দু'দিনেই গৃহিণী হয়ে বসল। ওদের পুরোনো চাকরকে সে তুই-তোকারি করে, মনিবদের স্বরেই হুকুম চালায়। কর্তার খাওয়া-শোওয়ায় যত্ন নিয়ে গৃহিণীর সঙ্গে তর্ক করে এবং তাঁকে ডিঙিয়ে ভবদেববাবুর স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করতে যায়। ওঁর পান-তামাক-জল সে আর কাউকে দিতে দেবে না। বিছানা ঝাড়বে নিজে হাতে, কাপড় কুঁচিয়ে রাখবে গৃহিণীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে, কিন্তু আর কোন কাজ করবে না। কর্তার কাপড় তুলবে ছাদ থেকে, ওঁর স্ত্রীর কাপড় তুলতে ভুলে যাবে, তার ফলে বৃষ্টিতে তা ভিজে গেলেও অপ্রতিভ হবার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাবে না ওর মুখে-চোখে।

তবু গৃহিণী কিছু বলেননি প্রথম প্রথম। শেষে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন—যখন মুখে মুখে তর্ক বা ঝগড়া শুরু করলে রাণী। মাসখানেক পরে একদিন ভবদেববাবুর পা টিপে দিতে বসল সন্ধ্যাবেলা। সেই থেকে প্রত্যহ। উনি সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন, বরং ওঁর স্ত্রীই বুঝিয়েছিলেন, 'তা হ'লই বা। ও ত তোমার মেয়ের চেয়েও ছোট। ধরো, তোমার মেয়ে থাকলে কি সেবা করত না?'

কিন্তু জিনিসটা চরমে উঠল যখন একদিন অফিসের ফেরৎ ভবদেববাবু এসে শুনলেন যে, মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে তাঁর স্ত্রী হঠাৎ মেয়ের বাড়ি চলে গিয়েছেন। ভবদেববাবু তখনই ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তাহ'লে আমি যাই এখনই—'

'সে কি কথা!' প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে বললে রাণী, 'তা কখনও হয়! এই তেতেপুড়ে এলেন, মুখহাত ধোওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, একটু মুখে কিছু দেওয়া নেই—কোথায় যাবেন এখনই? সে আমি যেতে দেবো না।

রাণী একেবারে দুহাতে দোর আগলে দাঁড়াল পাকা গিন্নীর মত। বরং ভবদেববাবুর মনে হ'ল, পুরাতন প্রণয়িনীর মত।

তবু কথাটা এড়াতে পারলেন না তিনি, দৈহিক প্রয়োজনও ছিল ত খানিকটা! স্নান, সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করে তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন, 'একটু না হয় সরবৎ করে দাও রাণী, আমি এখনই বেরোব।'

কিন্তু রাণী পরিপাটি করে আসন পেতে ঠাঁই করে দিয়ে চলে গেল, তারপর একটু বাদে বিস্মিত ভবদেববাবুকে হতবাক্ করে দিয়ে ঢুকল একথালা গরম লুচি ও কী সব তরকারি নিয়ে। থালাটা আসনের সামনে ধরে দিয়ে লজ্জিত স্মিতমুখে স্থির হয়ে দাঁড়াল সে।

বেশ খানিকটা সময় লাগল ভবদেববাবুর কথা কইতে। বললেন, 'এ—এসব কী রাণী, এত আমি খাবো না! এ সব করলে কে?'

রাণীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। বললে, 'আমি করেছি। কিন্তু এ ত লুচি, ভাত ত নয়। লুচি ত দোকান থেকে আনিয়ে খায় লোকে।

ভবদেববাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'খায় বৈ কি। কিন্তু আমি ত পরগোত্রে কিছু খাই না। আমাকে দোকান থেকে খাবার এনে খেতে দেখেছ কোনদিন?'

অকস্মাৎ রাণীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'খাবারের গায়ে আবার গোত্তর লেখা থাকে নাকি? না, খেলে জাত যাবে? আপনার গিন্নীর চেয়ে আমি ঢের পরিষ্কার ক'রে করেছি।'

ভবদেববাবুর কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে এল, 'এ সব ছোট মুখে বড় কথা বলবার সাহস পেলে কোথায়? আস্পর্দা ত কম নয়! তোমাকে দিয়ে আমার পোষাবে না, তুমি পথ দেখো। আমার এসব ঘি-ময়দা খরচ করলে কার হুকুমে তুমি?'

তিনি রাগ করে আর সরবৎও খেলেন না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। গভীর রাত্রে যখন ফিরে এলেন তখন রাণী তার পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে চলে গেছে, ওদের সেই পুরোনো চাকরকে বলে গেছে, 'আমার মাইনের টাকা থেকে ঘি-ময়দার দাম কেটে নিয়ে বাকি টাকা যেন পাঠিয়ে দেয়, বলিস বাবুকে।'

আমারও দুর্গ্রহ, নইলে ঠিক সেই সময়ে আমারই বা ঝি-চাকর সব চলে যাবে কেন এবং আমাদের বস্তির সুশীলা ঝি'র সুপারিশে রাণীকেই বা বহাল করব কেন!

প্রথম দিনই আমার স্ত্রী অনুপমা এসে বললে, 'এই ঝি রাখলে শেষে?' ভ্রূ কুঞ্চিত, মুখ গম্ভীর।

আমি ত প্রমাদ গণলাম, সত্যি কথা বলতে কি, রাণীকে তখনও আমি দেখিনি। বললাম, 'কেন গো, কি হয়েছে?'

'ওর শাড়ির বাহার দেখেছ? আর জামার? আবার সন্ধ্যাবেলা মুখে পাউডার ঘষে, তার ওপর চোখে কাজল টানে। ও আমার ঝি, না আমি ওর ঝি, লোকে বুঝবে কি ক'রে? তুমি ত সাতজন্মে একখানা ভাল কাপড় এনে দাও না, ঝিটা রাখলে বেছে বেছে কি মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেবার জন্যে?'

কাপড় সম্বন্ধে তার অনুযোগটা যদিও সর্বৈব মিথ্যা, তবু সেটা চেপে গিয়ে বলতে হ'ল, 'এসব ত আমি কিছু জানি না। সুশীলা ত তোমার সামনেই বললে ওর কথা, দেখলে। আমি কেমন করে জানব যে, উনি এত সৌখীন ঝি? যাক্—ওকে না হয় বলো যে, দরকার নেই—'

অনু বিরসমুখে বললে, 'থাক দুদিন। তুমি বলেছ যখন রাখবে,

তখন কি আর আজই তাড়ান চলে ? তোমার কথার দাম আছে ত। আর এধারে না হয় তক্কে তক্কে অন্য ঝি-চাকর ছাখো—'

কিন্তু রাণী বহাল হয়েই তার মনিবকে ডিঙিয়ে গেল। আমার যত্ন করবার জন্যে যেন উঠে প'ড়ে লাগল। শাড়ির কথাটা দেখলাম সত্যিই—অত কাপড় অনুরও বোধহয় নেই। পরে শুনেছি যে, দত্তবাড়ি থেকে পাওয়া সব টাকাই প্রায় সে রঙীন শাড়ি আর বাহারে' ছিটে খরচ করে ফেলেছে। ফলে আজ যে কাপড় পরে সে, কাল আর তা পরে না। আর প্রসাধনটাও যেন বড় অশোভন রকমের উগ্র।

তাও না হয় এক রকম সইত যদি কাজে-কর্মে তার তেমন মন থাকত। আমাকে যত্ন করতে চেষ্টা করে সে আমার স্ত্রীকে ডিঙিয়ে, কিন্তু আসল যে কাজের জন্যে তাঁকে রাখা, তাতে গাফিলতির অন্ত ছিল না। কাজ করতে বললেই বিরক্ত হ'ত। কথায় কথায় দত্তবাড়ির তুলনা দিয়ে, আমাদের জীবনযাত্রা যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর তাই বোঝাতে চেষ্টা করত। খুঁতখুঁতুনির অন্ত ছিল না। এখানকার খাওয়া-দাওয়াও তার পছন্দ হ'ত না। অনুকে প্রায়ই বোঝাত যে, আর একটা চাকর কিংবা বাসন মাজবার জন্যে আর একটা ঠিকা ঝি রাখা নিতান্তই প্রয়োজন আমাদের।

অনু হয়ত অবাক হয়ে প্রশ্ন করত, 'তাহ'লে তুমি কী করবে ?'

তাতে সে জবাব দিত, 'কেন! কাজের কি অভাব আছে বৌদি! এদিক ওদিক খুচরো কাজ কত!'

অনু রাগ ক'রে বলত যে, 'খুচরো কাজ আমি করে নিতে পারবো'খন। তুমি দয়া করে এখন বাসন মাজা, ঘর মোছার কাজটা করে দিলে বাঁচি। এইত আড়াইখানা লোকের সংসার, এর জন্যে আবার দুটো চাকর!'

আমাদের বাড়ির পাশেই সেই বিখ্যাত বস্তি, সেখানে রাণীর

যাতায়াত ছিল সুশীলার জন্যে। সুশীলা কে যেন হ'ত ওর—যদিও রাণী সেটা স্বীকার করত না, বলত, 'এমনি আলাপী' নয়ত 'দেশের লোক।' তবু অসময়ে দু-দুবার সুশীলার শরণাপন্ন হ'তে হয়েছে বলে সম্পর্কটাকে সোজাসুজি উড়িয়ে দিতে পারত না। সুশীলাদেরই সারের শেষ ঘরে থাকত নিরাপদ ঘরামি, ঘরামির কাজও করত আবার হাতে কাজ না থাকলে বাজারে আনাচ বেচত। বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বয়স, বলিষ্ঠ ধরণের অথচ দড়ি-পাকানো গোছ চেহারা। একবার বিয়ে করেছিল সে, সে স্ত্রী-পুত্র সব মারা গিয়েছে, সংসারে কেউ নেই, পয়সা রোজগার করে মন্দ না। কিছু জমিয়েছেও বোধ হয় হাতে, কারণ মধ্যে মধ্যে সামান্য তাড়ি খাওয়া ছাড়া আর কোন 'বার দোষ' নেই। পাত্র হিসেবে ভালই—তবে কেন যে আবার সংসার করেনি তা সে-ই জানে।

এ-হেন নিরাপদ আমাদের রাণীকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল, এ কথাটা সুশীলা-অম্বু মারফৎ পূর্বেই শুনেছিলুম। তারপর একদিন সে কী হৈ-হৈ কাণ্ড! নিরাপদ নাকি রাণীর হাত ধরে টেনেছে, সেই ব্যাপার উপলক্ষ করে চেঁচিয়ে গালাগাল দিয়ে হাট বাধিয়ে তুলেছে একেবারে রাণী। পাড়া-সুদ্ধ লোককে শুনিয়ে বলছে, 'এত বড় আস্পর্ধা ঐ ছোট লোকটার! এতদিন এ পাড়ায় আছি, কেউ কোনদিন একটা কথা বলতে সাহস করেনি, অতবড় দত্তবাড়ি কাটিয়ে এলুম, আমার নামে কেউ একটু বদনাম দিতে পারেনি—আর আমার হাত ধরে টানে ঐ মাতাল ঘরামিটা! ভিখিরী হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাও তুমি—এত সাহস!'

পাড়ায় ধন্য-ধন্য উঠে গেল রাণীর—সত্যি, ওর স্বভাব-চরিত্রটা নাকি ভাল খুব।

বেচারী নিরাপদ বার বার সকলের কাছে হাত জোড় ক'রে বলে যে, সে সেদিন মদ মোটে খায়নি, ওকে দাঁড় করিয়ে দুটো কথা বলতে

চেয়েছিল মাত্র, সেই জন্যেই হঠাৎ হাতটা ধরে ফেলেছিল। ওদের মধ্যে ত এমন রেওয়াজ আছে! ও যখন স্বামীর ঘর করবেই না, তখন এতে দোষ কি? খেটে খেতে হবে না, আরামেই থাকবে। তা-ও যদি এমনি ঘর করতে রাজি না হয়, বৈষ্ণব হয়ে কণ্ঠী বদল করুক, তাতেও নিরাপদ রাজি আছে। তার যা খরচ সে সব দেবে।

রাণী কিন্তু শুনে ঠোঁট উল্‌টে বলে, 'পোড়ার দশা! আমি ঐ বস্তিতে গিয়ে ঐ মাটির ঘরে বাস করছি ঐ বুড়ো মাতালের সঙ্গে! কেন, পুকুরে কি জল নেই? না, লাইন দিয়ে রেলগাড়ি চলে না? আমার খরচ জোগাতে পারবি তুই? তাই যদি করব ত আমার ভাতার কী অপরাধ করল? না, লোক জোটাতে চাইলে লোকের আমার অভাব আছে? কত ভদ্দর লোক সাধাসাধি করেছে আমাকে।'

এই বলে সে যেন নিরাপদের ধৃষ্টতাকে চিরকালের মত চূর্ণ করে দিয়ে যৌবন ও দম্ভের একটা লহর তুলে এসে আমার স্ত্রীর বড় আয়না বসানো আলমারিটার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের পাতাগুলো ঠিক করে অতি সাবধানে শাড়ির আঁচলের প্রান্ত দিয়ে দুই কষের খাঁজ থেকে পানের চিহ্ন মুছে নিতে লাগল। বলা বাহুল্য, পরোক্ষভাবে আমারই সামনে।

এর পর থেকে যেন ওর চরিত্রের একটা বড় রকম সার্টিফিকেট পেশ করতে পেরে ওর মেজাজ আরও বিগড়ে গেল। কাজের কথায় আমার স্ত্রীর মুখের ওপরই বলতে শুরু করলে দৈনিক দু-একবার করে, 'পারব না'—তাছাড়া ঝঙ্কার ও মুখনাড়া তো আছেই। অনু যেন চোর হয়ে থাকত ওর কাছে।

ওকে দিয়ে যে চলবে না বেশিদিন, তা বুঝেও তাড়াতে পারছিলাম না। তার কারণ অনুর বড্ড ভয় যে, ঝি আর এখন জুটবে না এবং

তাকেই সব করতে হবে—যদিচ মনে মনে সে রেগে আগুন হয়ে যেত, আমাকে যত্ন করতে আসার প্রচেষ্টা দেখে।

কিন্তু বেচারীর এমনই দুরদৃষ্ট যে, ওর মায়ের বাড়াবাড়ি অসুখ হওয়াতে অনুকে কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি চলে যেতে হ'ল।

'কী হবে গো ?' ছলছল চোখে শঙ্কিত মুখে প্রশ্ন করলে সে।

রাণী তাড়াতাড়ি বললে, 'সে তুমি ভেবো না বৌদি, দাদাবাবুকে আমি রেঁধে-বেড়ে দিতে পারব ঠিক। ওনার ত আর অত বাই নেই ঐ বামুন ঠাকুরের মত!'

চুপি চুপি স্ত্রীকে বলি, 'ছাখো, এ-সুবিধা এখন ছেড়ো না, এসে না হয় তাড়িও। নইলে সেই আমাকেই ত হাত পুড়িয়ে খেতে হ'ত।'

অনু কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে, 'কিন্তু ও সর্বনাশী যে আগুনের খাপরা—শেষে আমার সর্বনাশ করবে না ত ?'

'তুমি আমাকে এখনও অবিশ্বাস করো ? ছিঃ!' আহত কণ্ঠে জবাব দিই আমি।

'তোমার এই কাঁচা বয়স, তায় ভাল চেহারা—ও যদি গুণতুক করে, তুমি পারবে কেন ?'

খুব প্রসন্ন হই এ বর্ণনায়। খুশি হয়ে পরিহাসের সুরে বলি, 'তুমিও ফিরে এসে গুণতুক ক'রো এখন। আপাতত ত মায়ের ভাবনা ভাবো, তারপর ঝিয়ের কথা হবে'খন।'

সত্যিই আর তখন সময় ছিল না ওর অত কথা ভাববার। কাঁদতে কাঁদতে বেচারী গাড়িতে গিয়ে উঠল। একমাত্র পো'কে ডাইনের হাতে সমর্পণ করলে মায়ের মুখের চেহারা যেমন হয়, ওর মুখের ভাবও কতকটা সেই রকম।

প্রথম দিনটা কাটল নির্বিঘ্নেই। রাণী বেশ গুছিয়েই সংসার করলে।

আমার চা-জলখাবার দেওয়া, স্নানের সময় কাপড়-গামছা, স্নানের জল গুছিয়ে রাখা, যথাসময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে পরিপাটি করে ভাত ধরে দেওয়া—সবই করলে। বরং যেন অনুর চেয়েও তার দৃষ্টি সজাগ ও সতর্ক মনে হ'ল। রান্নাটা অত ভাল নয় বটে—তবে খাওয়া চলে।

বিকেলে ফিরে এসে দেখি, সারা দুপুর ধরে সে ঘরদোর গুছিয়েছে। বহুদিন পরে কাপড়-চোপড় আলনায় গুছানো আছে দেখে বড় আনন্দ হ'ল, কারণ এ কাজটা অনু কিছুতেই পারত না কোন দিন। শুধু তাই নয়, জুতোগুলো পর্যন্ত কালি-লাগানো, ঝকঝক করছে; টেবিলের ওপর খাতা, কাগজ-কলম সুন্দরভাবে সাজানো; তাকের ওপর বইগুলোও সে ঝেড়ে-মুছে তকতকে করে রেখেছে। রাণী যে এত কাজের লোক তা ত জানতুম না। তবে কেন অনু ওকে কুড়ে বলে অভিযোগ করত?

এসে মুখ-হাত ধুয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই চা ও খাবার নিয়ে এসে দাঁড়াল রাণী। গরম নিমকি, মামলেট, টোস্ট, সন্দেশ। এত পয়সা পেলে কোথায়? মনে মনে ভাবি। ও ত চায়নি আমার কাছে, অনু কি দিয়ে গেছে?

যাই হোক, স্মিত প্রসন্ন মুখে ওর কাজের প্রশংসা করলাম। রাণী লাল হয়ে উঠল যেন লজ্জায় ও আনন্দে। ওর এ ভাবটা ঠিক ভাল না লাগলেও প্রশংসা করতে হ'ল বৈকি। ছেলেমানুষ, এই অমানুষিক পরিশ্রম করেছে, এত ত করবার কথা নয় ওর!—

পরের দিন অফিস থেকে ফিরতেই সে কোথা থেকে ছুটে এসে নিজে হঠাৎ আমার পা থেকে জুতা-মোজা খুলে নিলে। এ আবার কি! এটা যে অত্যন্ত অশোভন তা বুঝেও বাধা দিতে পারলুম না। তার প্রথম কারণ, ঘটনাটা এত অতর্কিতে ঘটল যে, কী হচ্ছে বুঝতেই

খানিকটা সময় লাগল, ততক্ষণে সেটা হয়ে গেছে। তারপর বাধা দেবই বা কি ক'রে, 'ওকি করছ' 'ওকি করছ' বলা ছাড়া? নির্জন বাড়ি এবং যুবতী ঝি, হাত ধরে উঠিয়ে দিতে ত পারি না! হয়ত কে কোথা থেকে দেখে বলবে, ওর হাত ধরে টানাটানি করছিলাম।

সুতরাং চেপে যেতে হ'ল। মনটা খারাপ হয়ে গেল ভারি, কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

রাণীও বোধ হয় আমার মুখ দেখে বুঝেছিল আমার মনের ভাব, আর কোন বাড়াবাড়ি করলে না। কিন্তু রাত্রে আবার এক কাণ্ড।

আমাদের এই দোতালার ফ্ল্যাটে দুটি মাত্র ঘর। এতদিন রাণী ঐ পাশের ঘরেই শুত, সেদিনও শুয়েছে। হঠাৎ রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনি, কে যেন মৃদুভাবে কড়া নাড়ছে আমার ঘরের। কড়া নাড়ার ভঙ্গিতে কেমন একটা সংশয় হ'ল, একটু আতঙ্কের ভাবও এল মনে মনে। ভেতর থেকেই বেশ একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, 'কে?'

চাপা যেন একটা ভয়ার্ত কণ্ঠে উত্তর এল, 'একবার দোর খুলুন শীগগির, বোধ হয় চোর এসেছে!'

সে কি!

তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দোর খুলে দিই। দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে রাণী, মুখ একেবারে ভয়ে যেন বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। বললুম, 'কী, কী হয়েছে?'

'কে যেন মনে হ'ল ও পাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—'

ওপাশের অর্থাৎ রাস্তার দিকের বারান্দা—পাশের ঐ ঘরটার সঙ্গেই লাগানো এক ফালি সরু বারান্দা। তাড়াতাড়ি একটা লাঠি তুলে নিয়ে যাচ্ছি ওঘরের দোরটা খুলতে, হঠাৎ আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে রাণী, 'যাবেন না, যদি ওদের কাছে ছোরাছুরি থাকে?'

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলি, 'থাক্, অত ভয় করলে চলে না।'

দোর খুলে দেখলাম, কা কস্য পরিবেদনা—কেউ নেই। কেউ যে আসেনি তার প্রমাণ, যে কাপড়গুলো শুকোচ্ছিল সেগুলোও ঠিক আছে। আর সত্যিই রাস্তা থেকে থাম বেয়ে বারান্দায় ওঠা অত সহজ নয়।

বললাম, 'তুমি বোধ হয় স্বপন-টপন দেখে থাক্‌বে। এখন শোওগে—ওসব কিছু না।' ও একটু ইতস্তত করে যেন মরীয়া হয়ে বলে উঠল, 'আমি একা ওঘরে শুতে পারব না।'

বললাম, 'তবে ওঘরে মেঝেতে তোমার বিছানা করে নাও—আর আমার জন্যে এ ঘরে ক্যাম্প-খাটটা পেতে দাও।'

সে আরও ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচলটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে উত্তর দিলে, 'একা শুতে আমার ভয় করছে।'

এতক্ষণে তাকিয়ে দেখি, প্রসাধন ওর ঘুমের জন্যে কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি, বরং যেন মনে হচ্ছে, এইমাত্র একবার মুখে পাউডার বুলিয়ে তবে শয্যা ত্যাগ করেছে!

একটু কঠিন কণ্ঠে বললাম, 'তবে সুশীলাকে ডেকে ওর ঘরে শোওগে যাও, কাল থেকে ওখানেই শুয়ো রাত্রে।'

'দরকার নেই, আমি ওঘরেই শুচ্ছি।' এই বলে সে দুম্ দুম্ করে পা ফেলে পাশের ঘরে গিয়ে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

পরের দিনই সুশীলাকে ডেকে নোটিশ দিলাম। বললাম, 'আজই ওকে জিনিসপত্র নিয়ে চলে যেতে বল, আমি এমনিই একমাসের মাইনে দিয়ে দিচ্ছি।'

সুশীলা একটু অপ্রতিভ হ'ল, বললে, 'কী করি বলুন দেখি ছুঁড়িকে

নিয়ে? ও কোথাও গিয়ে ত টিকতে পারবে না। ও যে একেবারেই ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যায়!'

যাই হোক—মালপত্র নিয়ে আবার ও গিয়ে সুশীলার ঘরে উঠল। শুধু তাই নয়, সেইদিনই ব্যোমকেশদের বাড়িতে একটা কাজ জুটিয়ে নিলে। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম; ঘরের পাশের বস্তিতে থাকলে রোজ দুবেলা দেখা হ'ত—সে এক অস্বস্তি। আর ব্যোমকেশের বাড়িতে একগাদা লোক, বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। ওরা পাঁচ ভাই, তাদের পাঁচ বৌ, ছেলেমেয়ে, একেবারে হরিঘোষের গোয়াল। একরকম বেশ থাকবে'খন।

কিন্তু মাস দুয়েক বাদেই শুনলাম যে, রাণীর আবারও চাকরি গেছে। ব্যোমকেশের ছোটভাইয়ের স্ত্রী নাকি সত্যিসত্যিই ওকে খ্যাংরা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েটার ওপর আর রাগ হ'ল না—দুঃখই হ'ল। এ ওর কী কুগ্রহ—এমন করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

আবার দুঃখের মধ্যে হাসি—শুনলুম সুশীলার মুখে, নিরাপদ নাকি একটা ভাল শাড়ি কিনে সুশীলার ছোট মেয়েটাকে দিয়ে পাঠাতে চেষ্টা করেছিল—তাকে খুব গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিয়েছে! বেচারী নিরাপদ! ওর লজ্জাও নেই।...

তবু রাণীর কাজের অভাব হ'ল না। যুদ্ধের বাজারে আর সব জিনিসের সঙ্গে ঝি-চাকরও মহার্ঘ হয়েছে। এবার ব্যোমকেশদেরই বাড়িওয়ালা কিরণবাবুর ওখানে। কিরণবাবু বৃদ্ধ, সংসার বলতে তাঁর একটি বিশ্ব-বকাটে ছেলে আর ছেলের মা। ওঁর ছেলে এ অঞ্চলে একটা বিভীষিকা হয়ে আছে গত কয়েক বৎসর। কানাই তার নাম—

সে না শিখেছে লেখাপড়া, না কখনও চেষ্টা করেছে টাকা রোজগার করবার। জনশ্রুতি এই যে, এজন্যে নাকি কানাইয়ের মা-ই দায়ী। তিনি এক ছেলে বলে ছেলেকে কখনও শাসন করতে দেননি, উল্টে গোপনে তাকে টাকা জুগিয়েছেন। ব্যাপার দেখে কিরণবাবুও হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন; স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে তিনি একা ঝগড়া করে পেরে উঠবেন কেন? ফলে কানাই সমস্ত রকম নেশা ও আনুষঙ্গিকে পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। কিরণবাবুর ভরসার মধ্যে খান-দুই বাড়ির ভাড়া, তবে আগে তাতেই ওঁর স্ত্রীর হাতে কিছু কিছু থাকত, কানাইয়ের দেশী মদ ও খোলার ঘরের খরচা বরাবর জুটে গেছে ঠিক। কানাই মধ্যে খুবই বাড়িয়েছিল, গৃহস্থ-ঘরের দু'একটি ঝি-বৌয়ের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিল, কিন্তু পাড়ায় একদিন বিষম মার খেয়ে একটু শায়েস্তা হয়েছে। তাছাড়া ইদানীং কিরণবাবুর আয় না বেড়ে ব্যয় অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিল, কানাইয়ের হাতখরচাও তার মা কমাতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর, থাকতও না এমন কিছু, থাকলে অবশ্য কানাই ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। কিছুদিন যাবৎই সে মায়ের কাছে জোর করে পয়সা কেড়ে নিতে শুরু করেছিল, মারধোরও নাকি করেছে—অন্তত লোকে বলে।

এহেন কিরণবাবুর কাছে রাণী কী লোভে চাকরি করতে গেল তা ভেবে পেলাম না। সুশীলা নাকি বারণও করেছিল, কানাইয়ের স্বভাব-চরিত্র খুব খারাপ, ওখানে গিয়ে কাজ নেই—এসব কথা বুঝিয়েছিল অনেক করে, কিন্তু রাণী শোনেনি।

তবে কী লোভে যে রাণী গিয়েছে সেটা বোঝা গেল দুদিন পরেই—কিরণবাবু নিজে একদিন ভবদেববাবুর কাছে কান্নাকাটি করে গেলেন, 'যমরাজ কি একেবারে ভুলে গেছেন ভবদেববাবু? না, বুড়ো বয়সে

আত্মহত্যা করতে হবে?···মাগী কোনদিন ত আমার একটা কথাও শুনলে না, এখন তেম্‌নি হয়েছে ওরও। বাবু প্রকাশ্যে ঐ ঝিটাকে নিয়ে ঘর করছেন, আর সে ছুঁড়ি একেবারে যেন ঘরের গিন্নী হয়ে বসেছে। একেবারে সাতপাকের পুত্রবধূ আমার! কিচ্ছু বলবার জো নেই, বলতে গিয়ে মাগী সেদিন মার খেয়েছে, আমাকে শাসিয়েছে যে, যদি কিছু বলি ত খুন করে ফেলবে। বুড়ো বয়সে কি অপঘাতে মরব? মদ খেয়ে চোখ লাল করে যখন তেড়ে আসে ভবদেববাবু, তখন বুক শুকিয়ে যায়। এই ত আমার সাতষট্টি বছর বয়স, এখন কি ওর সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব, না বুড়ো বয়সে ছেলের হাতে মার খেয়ে অপমানের চূড়ান্ত হবো? বল্‌ব কি, এ আমার হয়েছে সাপের ছুঁচোগেলা। ঘরে-বাইরে অপমান, কারুর কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই, অথচ নিজের বাড়িতে নিজে চোর হয়ে আছি! হায়রে!··· কত পাপ যে করেছিলুম!'—ইত্যাদি।

বুঝলাম যে, রাণীর এতদিনে গৃহিণীপনার সাধ মিটেছে। ভদ্রলোকের বাড়ির কুলবধূ হবার শখটা শেষে এইভাবে মেটাতে হ'ল ওকে?

প্রতিদিনকার সহস্র কাজের মধ্যে ওসব কথা তারপর ভুলেই গিয়েছিলাম। এর ভেতর রাণীর নামটা দু-একবার কানে যে ওঠেনি তা নয়, কিন্তু সে কথায় মন দিইনি।

হঠাৎ মাস-ছয়েক পরে একদিন অনু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, 'ওগো, শুনেছ তোমার রাণীর কাণ্ড?

'আমার রাণীই বটে! কিন্তু কাণ্ডটা কি?'

'ঐ যে সুশীলাদের বস্তির পেছনের ঐ বাঁশবাগানে পড়ে আছে।

ওঠবার সামর্থ্য নেই। সর্বাঙ্গে ঘা, হাতপা পড়ে গেছে। আহা—বেচারীকে দেখলে আর চিনতে পারবে না।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সে কি! রাণী না কানাইদের বাড়িতে—'

'তাই ত। সেই জন্যেই ত এই কাণ্ডটি হ'ল। কানাইয়ের খারাপ রোগ আছে সকলেই জানে, সুশীলা সাবধানও করেছিল, ও তখন শোনেনি। তার ফল ফলল হাতে হাতে। অনেকদিনই হয়েছে, কোন চিকিৎসা ত হয়নি, করবে কে? কিরণবাবুর কাছে নগদ পয়সা নেই যে, কানাই কেড়ে নেবে, মায়ের গয়না ত কবেই বেচে মেরে দিয়েছে। রাণীর কাছে যা ছিল সোনা-রূপোর চুড়ি তা পর্যন্তও নিয়ে নিয়েছে। এমন কি ওর শাড়িগুলোও সিকি দামে বেচে নাকি মদ খেয়েছে ছোঁড়া। তারপর রোগ এখন খুব বেড়ে উঠেছে—সেবা করবে কে? আজ সকালে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। হাঁটতে পর্যন্ত পারে না, কোনমতে বুকে হেঁটে হেঁটে এসে ঐখানে পড়েছে।'

'তারপর? এখন ওর গতি কি হবে?

'কি হবে তা কে জানে? কে ওর সেবা করবে? ঐ রোগ জেনে-শুনে ঘাড়ে করবে কে? যখন রক্তের তেজ ছিল, কারুর কোন কথা শোনেনি। এখন এসেছেন দয়া চাইতে। কে দেখবে এখন! ঐ ভাবেই পড়ে থাকবে।'

তখন অফিস যাওয়ার তাড়া ছিল। আর কিছু কথা হ'ল না। ফিরেই অনুকে প্রশ্ন করলাম, 'কী হ'ল গো রাণীর? সেই ভাবেই পড়ে আছে?'

'ওমা, তা বুঝি জান না?' বিস্ফারিত চোখে সংবাদটা দিলে অনু। 'মাগো, মিরাপদটা কী বেহায়া আর নিঘিন্নে মা! ভাল থাকতে ত একদিনও ফিরে তাকায়নি—কী লাঞ্ছনা না করেছে—শেষ পর্যন্ত সেই

রাণীকেই ও ঘরে এনে তুললে ! ঐ কুচ্ছিত রোগ, ঘায়ের গন্ধে টেঁকা যায় না, দু'হাত দূর থেকে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।'

একটু বিস্মিত হ'লাম বৈকি !

তবে এটাও বুঝলাম যে, এই আশ্রয়ই রাণীর পাকা। কবিগুরুর ভাষায়—

"বোঁটা যবে কাটা গেল, বুঝিল সে খাঁটি,
সূর্য তার কেহ নয়, সবই তার মাটি।"

কিন্তু এটাও শেষ পর্যন্ত বেচারীর ভোগে এল না। নিরাপদ অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি। রিক্সা ভাড়া করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে প্রত্যহ, নিজে কোলে করে উঠিয়েছে নামিয়েছে—তারপর যখন সে সামর্থ্যও আর রইল না তখন চার টাকা ফিয়ের ডাক্তার বাসায় এনে দেখিয়েছে তিন-চার দিন। তা-ছাড়া দুঃখীর মত হাসপাতালে যেতে লজ্জা করে ব'লে এরই মধ্যে রঙীন শাড়ি এনে দিয়েছে, গিল্‌টি চুড়ি কিনে এনেছে খুঁজে খুঁজে। তবু কিছুতেই কিছু হ'ল না—মাস তিনেক ভুগে নানা রকমের রোগের জটিল চক্রান্তে রাণীকে একদিন চোখ বুজতে হ'ল। তবে জেদটা রাণীরই বজায় রইল শেষ পর্যন্ত, যেভাবে সে বাঁচতে চেয়েছিল, মরবার সময় চিকিৎসাটা পর্যন্ত সেইভাবেই হয়েছে। এর ভেতর মিষ্টি কথা সে একদিনও নিরাপদকে বলেনি—আদেশ করেছে, অসন্তোষ প্রকাশ করেছে—শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিরাপদকে জানিয়ে দিয়েছে যে, সে অনুগ্রহ করেই ওর ঘরে আছে এবং ওর পয়সা খরচ করাচ্ছে।

আর নিরাপদ ?

যে প্রণয়িনীকে সে কিছুতেই পেলে না কোনদিন, তারই জন্য শুধু যে সর্ব্বস্বান্ত হ'ল তাই নয়, বিপুল ঋণের বোঝা ওর ঘাড়ে চাপল।

আজও সে সেই দেনা শোধ করে চলেছে।
